Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা বিনতে করিম

রোলঃ 23090120621

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা বিনতে করিম

রোলঃ 23090120621

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতেমা বিনতে করিম, আইডিঃ 23090120621 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Fatema.

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ফাতেমা বিনতে করিম

আইডিঃ 23090120621

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

কুরআনের আলোকে সাহাবাদের মর্যাদা 7

হাদিসের আলোকে সাহাবাদের মর্যাদা 13

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের ফযীলত: 17

আনসার ও মুহাজির সাহাবা 24

ইসলামের জন্য সাহাবিদের আত্মত্যাগ ও বীরত্ব 29

সাহাবাদের গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 33

সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ 36

আহলে বাইত 42

নারী সাহাবিদের অবদান 45

মুসলমানদের কাছে সাহাবাদের মর্যাদা যেমন হওয়া উচিত 57

ভূমিকা

মুসলিম সমাজে বহুল পরিচিত একটি শব্দ ‘সাহাবি’। আরবি ভাষার এ শব্দটির অর্থ সঙ্গী-সাথি। পরিভাষায় যারা ঈমান অবস্থায় নবীজি (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ঈমান নিয়ে ইন্তেকাল করেছেন তাদের সাহাবি বলা হয়। সাহাবির সংখ্যা ১ লাখ ১৪ হাজারের মতো। এ সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও লক্ষাধিক হওয়ার ক্ষেত্রে সবাই একমত।

নবী-রাসুলগণের পরই সাহাবায়ে কেরামদের মর্যাদা। নবী করিম (সা.)-এর সংস্পর্শ ও সাহচর্যের কারণে তারা খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ মুমিনের মর্যাদা লাভ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামগণ হলেন সত্যের মাপকাঠি। তাদের মাধ্যমেই রক্ষিত হয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস। তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর রাসুল (সা.)। তাদের ব্যাপারে আমাদের এ আক্বীদা পোষণ করা ওয়াজিব যে, তারা উম্মতের অগ্রবর্তী দল এবং তাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ, তাঁর সাথে জিহাদ করা, তাঁর সাথে শরী'আত গ্রহণ করে পরবর্তীদের জন্য তা প্রচার করার উদ্দেশ্যে চয়ন করা হয়েছে।

যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ ও বিকাশ লাভের জন্য জরুরী বিশ্বস্ত শিশ্য ও কর্মচারীর। আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল হয়ে এলেন মুহাম্মাদ। তাঁকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার মতো বিশ্বাসীর দরকার ছিল। সাহাবায়ে কিরাম গণ ছিলেন সেই বিশ্বাসী। তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার মতো, তাঁর কথা মেনে নেওয়ার মতো নিষ্ঠাবান ভক্তবৃন্দের প্রয়োজন ছিল। সাহাবায়ে কিরাম গণ ছিলেন সেই ভক্তবৃন্দ।

নবুঅতের প্রচারক ও সংবাদ-বাহকের দরকার ছিল। সাহাবায়ে কিরাম গণ ছিলেন সেই সংবাদ-বাহক। প্রয়োজন ছিল নবুঅতের পতাকাধারী নির্ভিক বীর সেনাবাহিনীর। সাহাবায়ে কিরামগণ ছিলেন সেই পতাকাধারী বীর সেনাবাহিনী।

মহানবী বলেছেন,

مَا مِنْ نَبِي بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِى إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِه..... ِ

অর্থাৎ, আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হতো। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। (মুসলিম ১৮-৮নং)

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

مَا كَانَ مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِبُونَ يَهْتَدُونَ بِهَدِّيهِ وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِه ... ِ

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীরই (কিছু) সহযোগী ছিল। তারা তাঁর পথনির্দেশ অনুযায়ী পথ চলত এবং তাঁর আদর্শে আদর্শবান হত। (মুসলিম ১৮৯নং) তাঁরা ছিলেন মহান সৃষ্টিকর্তার নির্বাচিত,

মহানবী-এর বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র। তাঁরা সারা মুসলিম জাহানের শ্রদ্ধার পাত্র। 'রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।'

কুরআনের আলোকে সাহাবাদের মর্যাদা

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে সাহাবাবর্গের প্রশংসা করেছেন। যে সম্প্রদায়কে স্বীয় নবীর সহচররূপে নির্বাচিত করেছেন, সেই সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

১। তিনি বলেছেন,

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيدًا

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। (বাক্বারাহঃ ১৪৩)

এখানে وَسَطٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, মধ্যম। কিন্তু তা শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অর্থেও ব্যবহার হয়। আর এখানে এই (সর্বোত্তম) অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, যেমন তোমাদেরকে সর্বোত্তম ক্বিবলা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উম্মতও করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হল, তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্য দেবে। এই উম্মত সাক্ষ্য দেবে। আর এই জন্য وسط এর অনুবাদ ন্যায়পন্থীও করা হয়। (ইবনে কাসীর)

এ শব্দের আরেকটি অর্থ, মধ্যপন্থীও করা হয়। উম্মাতে মুহাম্মাদী হল মধ্যপন্থী অর্থাৎ, অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা থেকে তারা পবিত্র। আর এটাই হল ইসলামের শিক্ষা। এতে অতিরঞ্জন (কোন কিছুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি) এবং অবজ্ঞা (কোন জিনিসকে তার উপযুক্ত মর্যাদা থেকে একেবারে নীচে নামানোরও কোন অবকাশ) নেই। উক্ত আয়াতে সম্বোধন যদিও সারা উম্মতকে করা হয়েছে, তবুও তা অবতীর্ণ হওয়ার সময় প্রাথমিক পর্যায়ের উম্মত সাহাবাগণই। প্রাথমিকভাবে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, ন্যায়পন্থী ও মধ্যপন্থী জাতি।

সাহাবিদের প্রশংসা : সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۭ

অর্থ: "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচররা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদের রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।" (সুরা ফাতাহ, আয়াত : ২৯)

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি : মুহাম্মদ ইবনে কাব আল কুরাজি (রহ.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, রাসুল (সা.)-এর সাহাবি সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম সবাই জান্নাতবাসী হবেন—যদিও দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে থাকে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, এ কথা আপনি কোথা থেকে বলছেন? তখন এই আয়াত পাঠ করলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ

অর্থ: "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট আর তিনি তাদের জন্যে প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহাসাফল্য।" (সুরা : তাওবা, আয়াত: ১০০; মাআরিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা ৫৯১)

উক্ত আয়াতে প্রথম সারির সাহাবাবর্গের জন্য মহান আল্লাহ নিজ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের জন্য পরকালে সুখময় বাসস্থান প্রস্তুত রেখেছেন। আর তা হল মহা সাফল্য। আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন,

★وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থ: "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।"(সূরা ফাতাহ, আয়াত :২৯)

আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট : আল্লাহ রাসুল (সা.) ও তাঁর সাহাবির জন্য যথেষ্ট বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ★

অর্থ: "হে নবী, আপনি এবং যেসব মুসলমান আপনার সঙ্গে রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট।" (সুরা আনফাল, আয়াত : ৬৪)

পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : মহান আল্লাহ সাহাবিদের পরস্পরের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْم★ۙ

অর্থ: "তিনি তাঁদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। তুমি যদি পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদও ব্যয় করতে, তাহলে তাঁদের হৃদয়ে এই সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু তিনি তাঁদের অন্তরগুলো প্রতি সঞ্চার করেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।" (সুরা আনফাল, আয়াত : ৬৩)

মর্যাদায় তারতম্য : কোরআনে সাহাবিদের দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তা হলো, এক. যাঁরা মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, দুই. এরপরে ইসলামগ্রহণ করেছেন। প্রথম শ্রেণির সাহাবিদের মর্যাদা তুলনামূল বেশি। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْر★ۙ

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বেশি তাদের অপেক্ষা, যারা (মক্কা বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে।" (সুরা হাদিদ, আয়াত : ১০)

পরস্পর মিত্রভাব : আল্লাহ তাআলা সাহাবিদের পরস্পরের মধ্যে মিত্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ

অর্থ: "আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধরো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কোরো, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়েছ।" (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩)

কল্যাণের নিশ্চয়তা : আল্লাহ তাআলা চার শর্তে সাহাবিদের সফলতার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এক. রাসুল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনা, দুই. তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মান রাখা, তিন. তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা, চার. কোরআন অনুযায়ী চলা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ★

অর্থ: "সুতরাং যেসব মানুষ তাঁর (নবীর) ওপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে জ্যোতির অনুসরণ করেছে যা তার সঙ্গে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধু তারাই নিজেদের সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।" (সুরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

১.
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ★

অর্থ: "তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তাঁরাই সত্যনিষ্ঠ (বা সত্যবাদী)।" (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ১৫)

২.
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۙ

অর্থ: "কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় করেছেন, পক্ষান্তরে কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরাই (সাহাবিরা) সৎপথ অবলম্বনকারী।" (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ৭)
এইখানে আল্লাহ সাহাবিদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা বলেছেন।
তিনি তাঁর অনুগ্রহে ঈমানের প্রতি তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং একে তাদের অন্তরে প্রিয় করে তুলেছেন। ফলে তারা ঈমান এনেছে। আর তিনি তাদের অন্তরে কুফরী, ফাসেকী ও তাঁর অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়েছেন।
বস্তুতঃ এই গুণে গুণান্বিতরা হলো হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং সঠিক পথের অনুসারী।

৩. وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰي وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا

অর্থ: "আল্লাহ তাআলা তাদের তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন। বস্তুত তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।"
(সুরা : ফাতহ, আয়াত : ২৬)।
এই আয়াতে তাকওয়ার বাক্য বলতে তাওহিদ ও রিসালাতের বাক্য বোঝানো হয়েছে।

৪.
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۚ

অর্থ: "তাঁরাই (সাহাবিরা) সত্যিকারের মুমিন, মহান রবের কাছে তাদের জন্য আছে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।" (সুরা : আনফাল, আয়াত : ৪)
এ আয়াতে সাহাবাদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

সাহাবারা এই বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী, এরাই সত্যিকার অর্থেই মু'মিন। কারণ, তাদের মাঝে ঈমান ও ইসলামের প্রকাশ্য গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছে। তাদের প্রতিদান হবে নিজেদের প্রতিপালকের নিকট সুউচ্চ অট্টালিকা, গুনাহের ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। যা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নিয়ামত স্বরূপ তৈরি করে রেখেছেন।

৫.
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۭ

অর্থ: "তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে।" (আলে ইমরানঃ ১১০)
উক্ত আয়াতেও প্রাথমিকভাবে সাহাবাগণই উদ্দিষ্ট, তাঁরাই শ্রেষ্ঠতম উম্মত।

৬.
وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰي وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰي وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۭ وَسَاۗءَتْ مَصِيْرًا★

অর্থ: “আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মু'মিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!” (নিসাঃ ১১৫)

মহান আল্লাহ 'মু'মিনীন' তথা সাহাবাবর্গের পথকেই তাঁর পথ তথা বেহেশতের পথ বলে নির্ধারণ করেছেন এবং তাঁদের পথ ছাড়া অন্য পথকে দোযখের পথ বলে সতর্ক করেছেন।

৭.

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ★ ۚ

অর্থ: “যারা ঈমান এনেছে, (দ্বীনের জন্য স্বদেশত্যাগ) হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (মুমিনদেরকে) আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত মুমিন (বিশ্বাসী)। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।” (আনফালঃ ৭৪)

উক্ত আয়াতে সাহাবাগণকে প্রকৃত ও খাঁটি ঈমানদার বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৮.

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَي النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ

অর্থ: “আল্লাহ ক্ষমা করলেন নবীকে এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নবীর অনুগামী হয়েছিল, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, পরম করুণাময়।” (তাওবাহঃ ১১৭)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ জানিয়েছেন যে, তিনি সাহাবাবর্গের প্রতি বড় স্নেহশীল ও পরম করুণাময়।

৯.

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰي نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۡ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۙ

অর্থ: "মু'মিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।" (আহযাবঃ ২৩)
মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 'মু'মিন' সনদপ্রাপ্ত হলেন সাহাবাগণ। তিনি তাঁদের আচরণের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন।

১০.

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰي عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰي ۭ آللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

অর্থ: "বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং তার মনোনীত বান্দাদের প্রতি শান্তি!" (নামল: ৫৯)
উক্ত আয়াতে 'মনোনীত বান্দা' হলেন সাহাবাগণ। যাঁদেরকে মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর সাহচর্যের জন্য মনোনয়ন করেছেন এবং তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য নবীর সহযোগী ও মন্ত্রী নির্বাচন করেছেন। তাঁদের প্রতি শান্তি, তাঁদের জন্য নিরাপত্তা। তাঁদের জন্য শান্তিনিকেতন পরকালে।

হাদিসের আলোকে সাহাবাদের মর্যাদা

হাদিসের আলোকে সাহাবাদের মর্যাদা অনেক উঁচুতে। তারা ছিলেন নবী-রাসুলদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, কারণ তারা ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলাম প্রচারে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁদের এই মর্যাদা এতটাই যে, তাঁদের কেউ একজন, এমনকি যদি নবীর প্রতি সন্তুষ্টও না হন, তবুও তিনি সাড়ে নয়শত বছরের ইবাদতকারীর চেয়েও উত্তম। সাহাবিরা ইসলামের ভিত্তি, এবং তাঁদের ছাড়া ইসলামের শিক্ষা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

সাহাবাদের মর্যাদার মূল কারণসমূহ:
রাসূল (সা.)-এর সাহচর্য:

হাদিস অনুযায়ী, যারা ঈমান অবস্থায় রাসূল (সা.)-এর সঙ্গ লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন, তারাই সাহাবি।
রাসূল (সা.)-এর সঙ্গ লাভে ধন্য হওয়া তাঁদের অনন্য মর্যাদার প্রধান কারণ।

নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ:
ইসলামের জন্য তাঁদের ত্যাগ ও আত্মত্যাগ ইতিহাসে তাঁদের চিরস্মরণীয় করেছে।
তাঁরা দ্বীনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

অসাধারণ ইবাদত ও নৈতিকতা:
নবী-রাসুলদের পরেই সাহাবিদের স্থান দেওয়া হয়েছে, কারণ তাঁদের সাহচর্য তাঁদেরকে খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ মুমিন হিসেবে গড়ে তুলেছে।
তাঁদের ইবাদত ও নৈতিকতা এতটাই উচ্চমানের ছিল যে, একজন সাধারণ সাহাবির ইবাদতও সাড়ে নয়শত বছরের ইবাদতকারীর চেয়ে উত্তম বলে হাদিসে উল্লেখ আছে।

অনুসরণীয় আদর্শ:
তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্য তারকাতুল্য এবং অনুসরণীয় আদর্শ।
তাঁদের জীবন ও কাজ ইসলামের সঠিক পথ নির্দেশ করে।

খুলাফায়ে রাশেদীন:
সাহাবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন খুলাফায়ে রাশেদীন (চার খলিফা)।
তাঁদের খিলাফতের দায়িত্বের ক্রম অনুসারে তাঁদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য রয়েছে।

ঈমান ও আনুগত্য:
তাঁরাই হলেন সেই 'মুমিন' যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন, যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে।
তাঁরা সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত ছিলেন।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমগ্র সাহাবীগণই সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার হকদার। সমগ্র সাহাবীদের মধ্যে ৪ খলীফা মর্যাদা পাওয়ার দিক দিয়ে অন্যান্য সাহাবীদের চেয়ে বেশী হকদার এ কথা প্রত্যেক বিবেকবান লোক স্বীকার করতে একান্ত বাধ্য। উক্ত সার্বজনীন স্বীকৃত ইসলামী শরীয়াতের রীতি-নীতি প্রাথমিক যুগের মুসলিম মনীষীগণ যেমন

শ্রদ্ধা ভরে মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি পরবর্তী যুগের ইসলামী মনীষীগণও উপরোক্ত বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ সকলেই দ্বীনের ব্যাপারে ছিলেন ইনসাফকারী। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক সাহাবীদেরকেই ইনসাফকারী বলে আখ্যায়িত করে গেছেন। যথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهمديين وكلهم عدول متفق عليه

তোমাদের উপর আমার রেখে যাওয়া সুন্নাহ্ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শনকারী খলীফাগণের সুন্নাত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং উক্ত খলীফাগণের প্রত্যেকেই ইনসাফকারী।
অন্যত্র আছে, যার সানাদও সহীহ বটে, আর তা এই যে, আমার সব সাহাবীই ইনসাফকারী। ইমাম বুখারীর বর্ণনায় উক্ত সহীহ বুখারীর মধ্যেই كتاب فضائل الصحابة নামক অধ্যায়ের ৩৬৬৫ নং হাদীসে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, তোমরা (পরবর্তীকালে) আমার সাহাবীদেরকে গালি-গালাজ করো না।

عن أبي سعيد الخدري (رض) قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় সহীহ বুখারীর বিশ্বখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম ইবনু হাজার আস্কালানী বলেছেন, যারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নিজ চোখে দেখেনি, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য যাদের হয়নি, এমন সকলের জন্যেই উপরোক্ত নিষেধবাণী প্রযোজ্য হবে। (ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

প্রকাশ থাকে যে, পরবর্তীকালে খারিজী, রাফিজী, মু'তাজিলা, জায়েদিয়া, আশারিয়া, ইসমা'ঈলিয়া তথা শিয়া মাযহাবের লোকজন নিজেদের ভ্রান্ত-ধারণার বশবর্তী হয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের বিরুদ্ধে অনেক অনেক অপবাদ দেয়ার মতো ধৃষ্টতা ও অপরাধপূর্ণ সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে মুসলিম জাতিকে পারস্পরিক বিভেদ ও বিচ্ছেদের প্ররোচনা দিয়েছে। যা প্রতিটি বিবেকবান মুসলিমের নিকট অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বটে।

শার'ঈয়তের বিধিবিধানকে সম্পষ্ট করার জন্য এবং সঠিকভাবে মান্য করার জন্য সাহাবীগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে তার উপর বহাল থাকতে হবে। যেমন কুরআন একত্রিকরণ, খালীফাহ নির্ধারণ, 'উসমান < কর্তৃক তৎকালীন

পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাজারের মধ্যে জুমু'আহর দিন দ্বিতীয় আযান চালু করা। (বর্তমানে মাইকের আযান দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিধায় এখন এ আযান নিষ্প্রয়োজন।

বুখারী كتاب فضائل الصحابة পর্বে সহীহ সানাদে হাদীসসমূহে আছে, আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন স্বীয় ঘরে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় আবূ মূসা আল আশআরী বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আবূ বাকর অনুমতি চায় (প্রবেশের জন্য)। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে দাও। অতঃপর 'উমার অনুমতি চাইলে তাঁকেও এমনই বলে সুসংবাদ দেয়া হলো।
(বুখারী হাঃ ৩৬৭৩, বিস্তারিত বাখ্যা- ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা)

এভাবেই ৪ খলীফাহ সহ জলীলুল ক্বদর কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে আল্লাহ্র রসূল বিভিন্ন সময় অনেক সুসংবাদ জাতীয় ভবিষদ্বাণী করেছেন আল্লাহর আদেশক্রমে। এ জাতীয় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদের সংখ্যা ১০ জন।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীদের ব্যাপারেও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় পবিত্র মুখে চমৎকার মন্তব্য ক'রে তাদেরকে বিশ্ববাসীর নিকট সম্মানিত করেছেন। সুতরাং সাহাবীদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। অতীব পরিতাপের ও দুঃখের বিষয় এই যে, শিয়া মাযহাবের লোকজন ইসলামের উক্ত সম্মানিত ১ম থেকে ৩য় খলীফা দেরকে জবরদস্তিমূলক খিলাফত দখলকারী, অন্যায়কারী, অত্যাচারী পর্যন্ত বলার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। পক্ষান্তরে 'আলী এর প্রতি অতিরিক্ত মর্যাদা দিতে গিয়ে তারা তাঁকে পায় নবুয়্যাতের কাছাকাছি বা সম মর্যাদায় নিয়ে গেছে। আর কেউ কেউ শিয়াদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে গিয়ে মহামতি ইমাম হুসাইন কে গদীলোভী, অযথা রাষ্ট্রীয় শৃংখলা বিনষ্টকারী হিসেবে আখ্যায়িত করার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছে। ইমাম হাসান, হুসাইন আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, আর আহলে বাইতদের প্রতি মুহাব্বাত রাখার নির্দেশ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনেও তাদের পবিত্রতা এভাবে ঘোষিত হয়েছে

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ [الأحزاب: ٣٣]

সবশেষে সাহাবীদের ব্যাপারে সমীহ ভাবপ্রদর্শন ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের ফযীলত:

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকেদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী জিহাদের জন্য বের হবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছেন? তাঁরা বলবেন, হাঁ আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে। অতঃপর জনগণের উপর পুনরায় এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করেছেন? তখন তারা বলবেন, হাঁ আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে। অতঃপর লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের সাহচর্য প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সাহচর্য প্রাপ্ত হয়েছেন? বলা হবে আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে। (২৮৯৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৩৮৪)

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। 'ইমরান (রাঃ) বলেন, তিনি তাঁর যুগের পর দু'যুগ অথবা তিন যুগ বলেছেন তা আমার স্মরণ নেই। অতঃপর এমন লোকের আগমন ঘটবে যারা সাক্ষ্য প্রদানে আগ্রহী হবে অথচ তাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করবে না। তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। তারা হবে চর্বিওয়ালা মোটাসোটা। (২৬৫১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৭৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৩৮৫)

৩৬৫১. আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর এমন লোকদের আগমন হবে যাদের কেউ সাক্ষ্য দানের পূর্বে কসম এবং কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দান করবে। ইব্রাহীম (নাখ্‌য়ী; রাবী) বলেন, ছোট বেলায় আমাদের মুরুব্বীগণ আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার

করার কারণে আমাদেরকে মারধর করতেন। (২৬৫২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৭৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৩৮৬)

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামের আগুন এমন মুসলিমকে স্পর্শ করবে না যে আমাকে দেখেছে (অর্থাৎ সাহাবি), অথবা আমাকে যারা দেখেছে তাদের সে দেখেছে (অর্থাৎ তাবেয়ি)। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৮৫৮)

আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবিদের গালমন্দ কোরো না। কেননা তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে তাদের এক 'মুদ' (প্রায় ৩ ছটাক) কিংবা অর্ধ 'মুদ'-এর সমান খরচের সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (বুখারি, হাদিস : ৩৩৯৭; মুসলিম, হাদিস : ৪৬১১)

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে আমার সাহাবিদের কষ্ট দেয় সে যেন আমাকে কষ্ট দেয়; যে আমাকে কষ্ট দেয় সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দেয়; যে আল্লাহকে কষ্ট দেয় অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১৬৮০৩)

হজরত জাবির রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিদায় হজের দিন আরাফাতের ময়দানে রাসুলকে (সা.) কাসওয়া উটের ওপর আরোহী অবস্থায় উপদেশ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, হে মানুষগণ! আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি যার অনুসরণ ও অনুকরণ করলে তোমরা অবশ্যই পথ হারা হবে না। তা হলো, আল্লাহ পাকের কিতাব ও আহলেবাইত (রা.), (তিরমিজি)।'

সাহাবিদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, তাদের অনুকরণ- অনুসরণ করা প্রত্যেক মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। তাই আমরা আমাদের অন্তর থেকে গভীর প্রেম দিয়ে রাসুলে করিম (সা.)-এর সাহাবিদের ভালোবাসব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সব সাহাবিদের ফায়জ ও বরকত দান করুন। আওলিয়া কেরামদের তাওয়াজ্জুহ নসিব করুন। আমিন!

আশারায়ে মুবাশশারা:
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবির জীবন,অবদান ও ইসলামী ইতিহাস:

ইসলামের ইতিহাস এমন কিছু মানুষকে জানে, যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তারা হলেন — আশারায়ে মুবাশশারা, অর্থাৎ সেই দশজন সাহাবি যারা আল্লাহর নৈকট্য, রাসূল ﷺ-এর সান্নিধ্য, ঈমান, নৈতিকতা এবং ত্যাগের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করে মৃত্যুর আগেই জান্নাতের নিশ্চয়তা পেয়েছেন।

এই দশজন কেবল নামের তালিকা নয়— তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার ভিত্তি, উম্মাহর পথপ্রদর্শক, সাহস, নেতৃত্ব, দয়া, সত্যবাদিতা এবং আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ ত্যাগের জীবন্ত উদাহরণ।

তাদের জীবন অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়—
ঈমান + ত্যাগ + সত্য + নৈতিকতা = জান্নাতের পথ।

আশারায়ে মুবাশশারার হাদিসের ভিত্তি ও তাৎপর্য:
তিরমিজি, আবু দাউদসহ অন্যান্য গ্রন্থে রাসূল ﷺ বলেন:
“আবু বকর জান্নাতে, উমর জান্নাতে, উসমান জান্নাতে, আলী জান্নাতে, তালহা জান্নাতে, যুবাইর জান্নাতে, আবদুর রহমান ইবন আওফ জান্নাতে, সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস জান্নাতে, সাইদ ইবন যায়েদ জান্নাতে, এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জান্নাতে।”
এটি ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম প্রসিদ্ধ হাদিস।

কেন তাদের এই সৌভাগ্য?

- কঠোর পরিস্থিতিতে প্রথমে ঈমান গ্রহণ।
- দাওয়াত ছড়ানোর ত্যাগ।
- যুদ্ধক্ষেত্রে অবদান।
- রাসূল ﷺ-এর পাশে প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে অটল থাকা।
- দয়া, সততা, উদারতা, মানবিকতা।
- নৈতিকতার সর্বোচ্চ মানদণ্ড স্থাপন।

এই দশজন সাহাবি ইসলাম নামক বৃক্ষের মূল ভিত্তি।

আশারায়ে মুবাশশারার তালিকা:
১. আবু বকর সিদ্দীক রা.
২. উমর ইবনুল খাত্তাব রা.
৩. উসমান ইবন আফফান রা.

৪. আলী ইবন আবি তালিব রা.

৫. তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ রা.

৬. যুবাইর ইবন আওয়াম রা.

৭. আবদুর রহমান ইবন আওফ রা.

৮. সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রা.

৯. সাইদ ইবন যায়েদ রা.

১০. আবু উবাইদা আমির ইবনুল জাররাহ রা.

আবু বকর সিদ্দীক রা. — শ্রেষ্ঠ সাহাবি

১. জীবন ও চরিত্র

- ইসলামের প্রথম পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ মুসলিম।
- "সিদ্দীক" উপাধি রাসূল ﷺ-এর প্রতি পূর্ণ আস্থার কারণে।
- নম্র, দয়ালু ও উদার মানুষ।

২. ত্যাগের দৃষ্টান্ত

- সম্পূর্ণ সম্পদ রাসূল ﷺ-এর পথের জন্য দান করতেন।
- মদিনায় হিজরতের সময় নবী ﷺ-এর একমাত্র সঙ্গী।

৩. অবদান

- মিথ্যা নবীদের বিরুদ্ধে রিদ্দা যুদ্ধ পরিচালনা।
- কুরআন সংগ্রহের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ।
- দাস মুক্তিতে ব্যাপক ভূমিকা।

৪. শিক্ষা

আবু বকর রা.-এর জীবন আমাদের সত্য ও ঈমানের অবিচলতা শেখায়।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. — ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক

১. শক্তিশালী নেতৃত্ব

- ইসলাম গ্রহণের আগে কট্টর বিরোধী; পরে ইসলাম তার হৃদয় পাল্টে দেয়।
- দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে ১০ বছরের শাসন বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ।

২. প্রশাসনিক সংস্কার

- হিজরি সাল প্রবর্তন।
- প্রদেশ বিভাজন।
- দায়িত্বশীল প্রশাসন।
- বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা।

৩. যুদ্ধ ও বিস্তার

পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল অঞ্চল বিজিত হয় তাঁর শাসনামলে।

৪. ব্যক্তিত্ব

- সত্য কথা বলতে ভয় পেতেন না।
- জনগণের খোঁজ নিতে রাতের অন্ধকারে বের হতেন।
- দারিদ্র্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বিনয়ের প্রতীক

উসমান ইবন আফফান রা. — দানশীলতার অনন্য উদাহরণ

১. যুল নুরাইন

- রাসূল ﷺ-এর দুই কন্যার স্বামী।
- অত্যন্ত লজ্জাশীল এবং বিনয়ী।

২. কুরআন সংকলন

- উসমানী মুসহাফ তৈরির জন্য তিনি বিখ্যাত।
- কুরআনকে এক মানের রূপে সংরক্ষণ করেন।

৩. দানশীলতা

- তাবুক যুদ্ধে বিপুল সম্পদ দান।
- মদিনার অনাহার বাঁচাতে কূপ ক্রয় করে মুসলমানদের দান।
- গরিবদের পৃষ্ঠপোষকতা।

৪. শাহাদাত

- মুনাফিকদের চক্রান্তে শহীদ হন।
- তার মৃত্যু মুসলিম ইতিহাসে বড় অধ্যায়।

আলী ইবন আবি তালিব রা. — জ্ঞান, সাহস ও ন্যায়ের প্রতীক

১. শৈশবে ইসলাম গ্রহণ

- কিশোর বয়সে প্রথম মুসলিমদের অন্যতম।

· ছোটবেলা থেকেই রাসূল ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ।

২. যুদ্ধের বীরত্ব

· বদর, উহুদ, খাইবার— প্রতিটিতে কেন্দ্রীয় যোদ্ধা।

· খাইবার দুর্গের দরজা তিনি একাই তুলেছিলেন |

৩. চরিত্র

· পরহেজগার, জ্ঞানী, কুরআন-বিশারদ।

· সমস্যা ও বিচারবিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ।

৪. খিলাফতকাল

· রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে শাসন।

· সিফফিন যুদ্ধ, জামাল যুদ্ধের মত ঘটনা তার সময়ে ঘটে।

৫. তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ রা.

· উহুদ যুদ্ধে নবী ﷺ-কে নিজের দেহ দিয়ে রক্ষা।

· ৭০টির বেশি আঘাতের দাগ ছিল।

· দানশীল ও সাহসী।

৬. যুবাইর ইবন আওয়াম রা.

· ইসলামের প্রথম তরবারীধারী।

· বদর, উহুদ, খন্দক— সর্বত্র অগ্রণী।

· গোটা মধ্যপ্রাচ্যে তার বংশ শক্তিশালী নেতা তৈরি করে।

৭. আবদুর রহমান ইবন আওফ রা.

· ব্যবসায়িক দক্ষতায় বিখ্যাত।

· মদিনায় এসে হাতে কিছু না থাকলেও সবচেয়ে ধনীদের একজন হন।

· হাজার হাজার সৈন্যকে নিজ খরচে যুদ্ধযাত্রায় পাঠাতেন।

৮. সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রা.

· রাসূল ﷺ-এর আত্মীয়।

· প্রথম তীর ছোড়া সাহাবি।

· কাদেসিয়া যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি।

· পারস্য সাম্রাজ্য পতনে তার ভূমিকা ঐতিহাসিক।

৯. সাইদ ইবন যায়েদ রা.

· ইসলামের প্রথম যুগের সত্য অনুসারী।

· জাহেলিয়াত যুগেই মূর্তি পূজা বর্জন।

- বদরসহ বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয়।
- উমর রা.-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

১০. আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.

- রাসূল ﷺ বলেছেন — "তিনি আমার উম্মতের আমিন"।
- নম্র, বিশ্বস্ত, দায়িত্বশীল।
- শাম বিজয়ে প্রধান সেনাপতি।
- plague (তাউনে) রোগে শহীদ হন।

আশারায়ে মুবাশশারার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. ঈমানের দৃঢ়তা।

কঠিন সময়ে তারা ঈমান ধরে রেখেছেন— নির্যাতন, ক্ষুধা, নির্বাসন, যুদ্ধ— সব কিছুই মোকাবিলা করেছেন।

২. ত্যাগ ও কুরবানি

- সম্পদ
- পরিবার
- সময়
- নিরাপত্তা

সবকিছু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

৩. নৈতিকতা

সত্যবাদিতা, দয়া, ক্ষমা, ন্যায়পরায়ণতা ছিল তাদের জীবনের কেন্দ্রে।

৪. নেতৃত্ব

উমর, উসমান, আলী — তিনজন খলিফা।

আবু উবাইদা — উম্মতের আমিন।

সাদ — মহান সেনাপতি।

আবদুর রহমান — দানশীল ব্যবসায়ী।

৫. রাসূল ﷺ-এর প্রতি আনুগত্য

তারা রাসূল ﷺ-এর প্রতিটি নির্দেশ মানতেন, তাকে রক্ষা করতেন, তার পাশে যুদ্ধ করতেন।

আশারায়ে মুবাশশারা আমাদের কী শেখায়?

আশারায়ে মুবাশশারা ইতিহাসের দশটি আলো ছড়ানো নক্ষত্র। তাদের জীবন আমাদের শেখায়:

- ✔ সত্যের পথে অটল থাকা।
- ✔ দুনিয়ার লোভ ছাড়াই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।
- ✔ দানশীলতা ও মানবিকতা।
- ✔ সাহস ও ত্যাগ।
- ✔ নৈতিক ও শুদ্ধ জীবন।
- ✔ নেতৃত্ব, সততা ও দায়িত্বশীলতা।

এই সাহাবিরা প্রমাণ করেছেন—
জান্নাত অর্জন শুধু ইচ্ছা নয়, বরং কর্ম, নৈতিকতা, ত্যাগ ও ঈমানের ফল।

আনসার ও মুহাজির সাহাবা

ইসলামের ইতিহাসে এমন দুই শ্রেণির মানুষ আছেন, যাদের ত্যাগ, ভালোবাসা, ঈমান,ভাইচারিতা আজও বিশ্ব মুসলিম জাতির কাছে অনন্য দৃষ্টান্ত— তারা হলেন **মুহাজির** (হিজরতকারী) এবং **আনসার** (সহায়ক) সাহাবাগণ।

মুহাজিররা মক্কা থেকে ইসলামের জন্য সবকিছু ত্যাগ করে মদিনায় চলে আসেন, আর আনসাররা তাদের ভাইয়ের মতো বুকে স্থান দেন।

কোরআনে আল্লাহ তাআলা মুহাজিরদের ত্যাগকে এবং আনসারদের ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, সেবাকে অসংখ্য আয়াতে প্রশংসা করেছেন। রাসূল ﷺ-ও তাদের সম্পর্কে বহু হাদিসে বিশেষ মর্যাদা ঘোষণা করেছেন।

মুহাজির ও আনসারের সংজ্ঞা:

মুহাজির কারা?

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টির জন্য, বিশ্বাস রক্ষা করার জন্য, মক্কার অত্যাচার থেকে বাঁচতে **নিজ ভূমি, পরিবার, সম্পদ, ঘরবাড়ি রেখে মদিনায় হিজরত** করেছেন— তারা মুহাজির।

কোরআনে বলা হয়েছে:

وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে।"(সূরা হাশর : ০৮)

আনসার কারা?

মদিনার আওস ও খাজরাজ গোত্রের মুসলমানরা, যারা মুহাজিরদের স্বাগত জানায়, ঘরে জায়গা দেয়, সম্পদ ভাগ করে দেয় এবং রাসূল ﷺ-কে সমর্থন করে— তারা আনসার।

আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ

"আর যারা মদিনা ও ঈমানকে আপন ঠিকানা বানিয়েছে।"(সূরা হাশর : ০৯)

কোরআনে মুহাজিরদের মর্যাদা:

কোরআন মুহাজিরদের ত্যাগ, ঈমান, ধৈর্য, দৃঢ়তার বহুবিধ প্রশংসা করেছে।

১. জান্নাতের প্রতিশ্রুতি :

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْمَغْفِرَةُ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে... তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।"(সূরা আনফাল :৭৪)

২. প্রথম গ্রহণকারীদের প্রশংসা:

السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

"মুহাজিরদের মধ্যে যারা আগে ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা সর্বশ্রেষ্ঠ।"(সূরা তাওবা :১০০)

৩. পরীক্ষা ও ত্যাগ:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ

“যারা হিজরত করেছে এবং যাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে...”(সূরা আল ইমরান :১৯৫)

কোরআন মুহাজিরদের ত্যাগকে আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আমল হিসেবে উল্লেখ করেছে।

হাদিসে মুহাজিরদের মর্যাদা:

রাসূল ﷺ মুহাজিরদের সম্পর্কে বহু হাদিসে বলেছেন:

১. শ্রেষ্ঠত্ব:

“সর্বোত্তম মানুষ তারা, যারা আমার সঙ্গে মক্কা থেকে হিজরত করেছে।”(বুখারি)

২. ধৈর্য ও ঈমান:

মক্কায় অত্যাচার, বাধা, নির্যাতন— সবকিছু তারা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করেছে।

“মুহাজির সেই যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করে।”(তিরমিজি)

৩. প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ:

বদর, উহুদ, খন্দক— সব যুদ্ধের সামনের সারিতে ছিলেন মুহাজিররা।

কোরআনে আনসারদের মর্যাদা:

আনসারদের শ্রেষ্ঠত্বকে কোরআন এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছে।

১. ভালোবাসা ও নিঃস্বার্থতা:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

“তারা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়।”(সূরা হাশর : ৯)

এ আয়াত আনসারদের নিষ্ঠা, উদারতা ও স্নেহের সর্বোচ্চ স্তর নির্দেশ করে।

২. মদীনার ভিত্তিস্তম্ভ:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ

“যারা মদিনা ও ঈমানকে নিজেদের ঘর বানিয়েছে।”(সূরা হাশর: ০৯)

৩. আনসারদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্টি:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ... وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ

“মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী— আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।”(সূরা তাওবা :১০০)

হাদিসে আনসারদের মর্যাদা:

১. রাসূল ﷺ-এর ঘোষণা

“আনসার আমার অন্তরের মানুষ।”(বুখারি)

২. তাদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন

“আনসারদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন, আর তাদের প্রতি ঘৃণা কপটতার নিদর্শন।”(বুখারি)

৩. তাদের দুঃখ–দুর্দশায় সাহায্যের নির্দেশ

হুনাইন যুদ্ধে আনসারদের মন খারাপ হলে রাসূল ﷺ বলেছিলেন—

“তোমরা কি খুশি নও যে লোকেরা সম্পদ নিয়ে যাবে আর তোমরা রাসূলকে নিয়ে ফিরবে?”

এ কথা শুনে আনসাররা অশ্রু ধরে রাখতে পারেননি।

আনসার ও মুহাজিরদের পারস্পরিক সম্পর্ক:

১. ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির ঘোষণা (মু'আখাত)

রাসূল ﷺ মুহাজির–আনসারদের জোড়ায় জোড়ায় ভাই বানিয়ে দেন।

— কেউ ঘর দিল

— কেউ জমি দিল

— কেউ ব্যবসার অর্ধেক দিয়ে দিল

— কেউ সম্পদ ভাগ করে নিল

ইতিহাসে এমন উদাহরণ মানবসভ্যতায় আর নেই।

২. সম্পদ ভাগাভাগি

আনসাররা বলেছিল:

“হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বাগান ও সম্পদের অর্ধেক তাদের দিয়ে দিন।”

মুহাজিররা উত্তর দিল:

“আমরা তোমাদের সম্পদ চাই না, শুধু আমাদের কাজ করতে দাও।”

৩. সামাজিক পরিবর্তন

গোত্রবাদ ভেঙে নতুন ইসলামী সমাজ গঠন।

মদিনা সনদ: মুসলিম ঐক্যের ভিত্তি।

নিরাপত্তা, শিক্ষা, যুদ্ধ— সব কাজে আনসার–মুহাজির যৌথ ভূমিকা।

ত্যাগের উদাহরণ:

১. সা'দ ইবন রাবি (আনসার)

আবদুর রহমান ইবন আওফকে বললেন:

“আমার দুই স্ত্রী আছে; তুমি যাকে পছন্দ করবে তাকে তালাক দিয়ে দেব, ইদ্দত শেষ হলে তুমি বিয়ে করবে। আমার সম্পদও ভাগ করে নাও।”

আবদুর রহমান বললেন—

“বারাকাল্লাহ! আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন।”

২. মক্কার নির্যাতিত মুহাজিররা

বিলাল রা.— বালুর উপর নির্যাতন।

খব্বাব রা.— আগুনের কয়লায় শোয়ানো।

সুমাইয়া রা.— প্রথম শহীদ।

আম্মার রা.— পরিবার হারানো।

উম্মে সালামা রা.— সন্তান ছিনিয়ে নেওয়া।

এই ত্যাগই মুহাজিরদের উচ্চ মর্যাদার কারণ।

কোরআন–হাদিসে তাদের যৌথ প্রশংসা:

কোরআন বলে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ... وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

“যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জিহাদ করেছে... এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে— তারাই সত্যিকারের মুমিন।”(সূরা আনফাল : ৭৪)

হাদিস বলে:

"মুহাজির ও আনসার— উভয়ের মধ্যের শ্রেষ্ঠরা জান্নাতে যাবে।"

আমাদের জন্য শিক্ষা:

আনসার ও মুহাজিরদের জীবন মুসলিম উম্মাহর জন্য শিক্ষার ভাণ্ডার:

ঈমানের জন্য ত্যাগ:

মুহাজিররা শেখায়—ধর্মের জন্য সবকিছু ছাড়াও যায়।

দয়া ও অতিথিপরায়ণতা:

আনসাররা শেখায়—ভালোবাসা ও সেবা ঈমানের অংশ।

ভ্রাতৃত্ব:

ইসলামে জাতি, গোত্র, বর্ণ—সবকিছু তুচ্ছ। ঈমানই ভাইচারিতার মূল।

আল্লাহর পথে সহযোগিতা:

তারা একে অপরকে সাহায্য করেছে; ইসলামী সমাজ গড়েছে।

আত্মত্যাগ:

নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া— এটি আল্লাহর বিশেষ পছন্দ।

নেতৃত্ব:

তাদের ওপর ভর করে ইসলাম মদিনা থেকে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

সর্বোপরি, আনসার ও মুহাজিররা প্রমাণ করেছেন— ত্যাগ + ভ্রাতৃত্ব + ঈমান = আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত।

ইসলামের জন্য সাহাবিদের আত্মত্যাগ ও বীরত্ব

আখিরাতের কঠিন সময়ে আল্লাহর কাছে প্রতিদান ও সওয়াব লাভের আশায় নিজের অর্থ-সম্পদ, সময় কিংবা জীবন বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দ্বিনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হয় আরবিতে একে 'তাজহিয়া' বলে। তাজহিয়া তথা দ্বিনের জন্য ত্যাগ স্বীকার বা আত্মোৎসর্গ করার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলেন হজরত বেলাল বিন রাবাহ, মুসআব বিন

উমায়ের, খাববাব ইবনুল আরাতসহ সকল সাহাবায়ে কেরাম এবং তৎপরবর্তী মনীষীগণ। তাদের ত্যাগ স্বীকারের ইতিহাসে রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষা ও সফলতা। নিম্নে দ্বিনের পথে আত্মোৎসর্গে বা ত্যাগ স্বীকারের কয়েকটি মাধ্যম উল্লেখ করা হলো—

স্বার্থ ত্যাগ করা

দ্বিনের জন্য নিজের পছন্দনীয় বস্তুটিকে অপরের জন্য বিসর্জন দেওয়ার অর্থই হলো স্বার্থ বিসর্জন।

পূর্ণাঙ্গ ঈমানের দাবি হলো অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।' (বুখারি, হাদিস : ১৩)

স্বার্থ ত্যাগের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলেন সাহাবায়ে কেরাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করার পর আনসারদের সঙ্গে মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন।

তখন আনসার সাহাবি সাদ বিন রাবি (রা.) আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-কে বলেছিলেন, 'আনসারদের মধ্যে আমি সর্বাধিক সম্পদের অধিকারী। আমি আমার সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করে দেব। আমার দুজন স্ত্রী আছে, আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব। ইদ্দত শেষে তাকে আপনি বিয়ে করবেন।

ইবনু আওফ (রা.) তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন এবং ব্যবসার পথ বেছে নিলেন। (বুখারি, হাদিস : ৩৭৮০)

জীবন উৎসর্গ করা

একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো নিজের জীবন। স্বল্প সময়ের এই জীবনকে ঘিরেই মানুষের বুকে নানা স্বপ্ন-আশা লালিত হয়। তার এই প্রিয় জীবনকে যখন আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে, তখন সেটা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসর্গ। আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদের মধ্যে অনেকে আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।

তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর তারা তাদের অঙ্গীকার আদৌ পরিবর্তন করেনি। (সুরা : আহজাব, আয়াত : ২৩)

হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সর্বোত্তম জীবন হলো সেই ব্যক্তির জীবন, যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে। শত্রুর উপস্থিতি ও শত্রুর দিকে ধাবমান হওয়ার শব্দ শোনামাত্র ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে। যথাস্থানে সে শত্রুকে হত্যা এবং নিজ শাহাদাতের সন্ধান করে। (মুসলিম, হাদিস : ১৮৮৯)

অর্থ-সম্পদ উৎসর্গ করা

নিজের জীবন উৎসর্গের পাশাপাশি আল্লাহর পথে সম্পদ উৎসর্গ করা দ্বিন প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি মাধ্যম। মহান আল্লাহ জীবন ও রক্তের আগে সম্পদ উৎসর্গ করতে বলেছেন। কেননা জীবন চলে গেলে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার আর সুযোগ থাকে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা বেরিয়ে পড়ো অল্প সংখ্যায় হও বা অধিক সংখ্যায় হও এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে তোমাদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো। (সুরা তাওবা, আয়াত : ৪১)

সময় উৎসর্গ করা

সময় মানুষের অমূল্য সম্পদ। সময়ের সমষ্টিই জীবন। সময়ের মাঝেই মানুষ বেঁচে থাকে। যারা জীবনের অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারে, সফলতা তাদের পদ চুম্বন করে। সময়ের উৎসর্গ করে যারা জীবনের মুহূর্তগুলোকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হয়। আল্লাহর পথে সময় উৎসর্গ করার ফজিলত বর্ণনা করে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সকল কিছুর চেয়ে উত্তম। (বুখারি হাদিস : ২৭৯২)

তা ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইবাদতে বান্দা যে সময় ব্যয় করে, সেটাও সময়ের উৎসর্গ হিসেবে গণ্য হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমি তাদের প্রত্যাদেশ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, নামাজ আদায় করতে এবং জাকাত প্রদান করতে। আর তারা আমারই ইবাদত করত।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭৩)

এই আয়াতে আল্লাহ বান্দাকে সময়ের কোরবানি করে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং জাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি অংশ উৎসর্গ করতে বলেছেন।

শ্রম বিসর্জন দেওয়া

দ্বিন প্রতিষ্ঠায় কখনো নিজের শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে। তখন আল্লাহর পথে শ্রম বিসর্জন দেওয়া মুমিন বান্দার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। খন্দকের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম যে মেহনত করেছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় অমলিন হয়ে আছে।

এ সময় পরিখা খননের কাজে মাটি বহন করার কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শরীর ধূলি-ধূসরিত হয়েছিল। (বুখারি, হাদিস : ৪১০৪)

মসজিদে নববী নির্মাণের সময়ের ঘটনা। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, মসজিদে নববী নির্মাণের সময় আমরা মাথায় একটি করে ইট বহন করছিলাম। আর আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) একটির বদলে দুটি করে ইট বহন করছিলেন। এ দৃশ্য দেখে রাসুলুল্লাহ (সা.) আম্মারের মাথার ধুলা ঝেড়ে দিয়ে বলেন, 'হে আম্মার, তুমি কি তোমার বন্ধুদের মতো একটা করে ইট বহন করতে পার না? তখন আম্মার (রা.) বলেন, 'আমি আল্লাহর নিকট থেকে অধিক নেকি কামনা করি।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১১৮৭৯)

মহান আল্লাহ আমাদের দ্বিন ও ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গের তাওফিক দান করুন।

সাহাবিদের বীরত্ব

সাহাবিদের বীরত্ব ছিল ইসলামে একটি অন্যতম প্রধান বিষয়, যা তাঁদের ঈমান, সাহস এবং আত্মত্যাগের প্রমাণ বহন করে। বদর যুদ্ধে কিশোর সাহাবি মুআজ ইবনে আমর (রা.) ও মুআজ ইবনে আফরা (রা.)-এর মতো সাহাবিরা আবু জাহেলকে হত্যা করে বীরত্বের পরিচয় দেন। উহুদ যুদ্ধে উম্মে আম্মারাহ (রা.)-এর মতো নারী সাহাবিরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বাজি রেখে রাসুল (সা.)-কে রক্ষা করেন।

বদর যুদ্ধের সাহাবিদের বীরত্ব

কিশোর সাহাবিদের বীরত্ব: বদর যুদ্ধের এক পর্যায়ে দুজন কিশোর সাহাবি, মুআজ ইবনে আমর (রা.) ও মুআজ ইবনে আফরা (রা.), আবু জাহেলকে হত্যা করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অনুমতি চান। তাদের বীরত্বপূর্ণ আক্রমণে আবু জাহেল নিহত হন এবং তারা প্রমাণ করেন যে ঈমানের দৃঢ়তা বয়সকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

আবু বকরের আত্মত্যাগ: বদর যুদ্ধের জন্য আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করেছিলেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তাকওয়া ও সাহসের উদাহরণ: বদরের যুদ্ধে সাহাবিরা আল্লাহর উপর অটল বিশ্বাস রেখেছিলেন এবং ফেরেশতাদের সাহায্য পেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়।

উহুদ যুদ্ধে নারী সাহাবিদের বীরত্ব

উম্মে আম্মারাহ (রা.): তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারীরূপে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে রাসুল (সা.)-কে আক্রমণ করা হচ্ছে, তখন তিনি মশাল হাতে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি তীর ছুঁড়ে শত্রুদের প্রতিহত করেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে রাসুল (সা.)-এর সুরক্ষা নিশ্চিত করেন।

অন্যান্য নারী সাহাবিদের ভূমিকা: উহুদ যুদ্ধে নাসিবা বিনতে কাব (রা.)-এর মতো আরও অনেক নারী সাহাবি তাদের স্বামী ও পুত্রদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজেদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন।

অন্যান্য সাহাবিদের বীরত্ব -

খন্দকের যুদ্ধে যুবাইর (রা.): খন্দকের যুদ্ধের সময়, বনু কুরাইজা গোত্রের সাথে মক্কার কুরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের পর, যুবাইর (রা.)-কে গুপ্তচর হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সাহসিকতার সাথে শত্রুদের সংবাদ নিয়ে ফিরে আসেন।

যুবাইর (রা.)-এর ভালোবাসা: একবার মক্কায় গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বন্দী করা হয়েছে, তখন যুবাইর (রা.) তলোয়ার হাতে নিয়ে প্রতিশাোধ নিতে বেরিয়ে পড়েন। সাহাবিদের এই বীরত্বপূর্ণ কাহিনীগুলো সাহসিকতা, আত্মত্যাগ এবং ঈমানের গভীরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

সাহাবাদের গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

সাহাবিদের গুণাবলি

হিজরতের সময় সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয়রত নবী করিম সা. সঙ্গী হজরত আবু বকরকে বলেছিলেন, 'বিষন্ন হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।' -সুরা তওবা: ৪০

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন সাহাবায়ে কেরাম। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানুষের জন্য তারা সত্যের মাপকাঠি। এ কারণে তাদের প্রতি নিজের রাজির কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন আল্লাহ। সাহাবিরা যেসব গুণের অধিকারী ছিলেন, আমাদেরও উচিত ওইসব গুণাবলি অর্জন করা। যেন আল্লাহ আমাদের ওপর রাজি ও সন্তুষ্টি হোন। নিচে সাহাবিদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো

দৃঢ় ইমান ও বিশ্বাস : সাহাবিদের ইমান সম্পর্কে কোরআনে অসংখ্য আয়াত বর্ণিত হয়েছে। শুধু সুরা আনফালেই প্রায় ২০ জায়গায় সাহাবিদের ইমানের কথা আলোচিত হয়েছে। কোরআন মানবজাতির জন্য যেসব মর্ম ও আদেশ, আকিদা ও আদর্শ নিয়ে এসেছিল, সাহাবিরা সেসবের ওপর পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা সেগুলোর ওপর পূর্ণমাত্রায় আমল করেছেন। কোরআনে বলা হয়েছে, 'ইমানদারদের ভেতর এমন লোক আছে, যারা কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটায়নি।' সুরা আহজাব : ২৩

ইবাদত ও ইখলাস : আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সাহাবিরা বেশিরভাগ সময় নানা প্রকার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তারা একমাত্র আল্লাহর জন্য এসব ইবাদত করতেন, অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। জান্নাত লাভ, আল্লাহর প্রিয় হওয়াই তাদের অভিপ্রায়। ফলে তাদের পুরো জিন্দেগি ইবাদতে পরিণত হয়েছিল।

সৎ কাজের আদেশ : কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, '(হে মুসলিমরা) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা পুণ্যের আদেশ করে থাকো ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাকো এবং আল্লাহর প্রতি ইমান রাখো।' সুরা আলে ইমরান : ১১০

এই আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামসহ সমগ্র মুসলিম উম্মতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে সাহাবিরা জীবনভর এই আদেশের ওপর আমল করেছেন পূর্ণাঙ্গরূপে। যখন জবানের প্রয়োজন হয়েছে, জবান দিয়ে আর যখন জীবন ও সম্পদের প্রয়োজন হয়েছে, তখন জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদের মাধ্যমে। শুধু এতটুকু নয়, তারা পরবর্তী প্রজন্ম তাবেঈদেরও এসব গুণাবলি শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় : সাহাবিরা তাদের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন। হজরত আবু বকর (রা.), হজরত ওমর (রা.), হজরত উসমান (রা.), হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) প্রমুখ সাহাবি জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ দিয়েও জিহাদের ময়দানে অবদান রেখেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'রাসুল এবং যেসব লোক তার সঙ্গে ইমান এনেছে তারা নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। তাদেরই জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ এবং তারাই কৃতকার্য।' সুরা তওবা : ৮৮

সত্যবাদিতা ও জ্ঞানার্জন : সাহাবিরা নবী করিম (সা.) থেকে শরিয়তের সব বিষয়ের জ্ঞানার্জন করেছেন। সাহাবিরা আল্লাহর আদেশ পালনে এবং জিহাদে পূর্ণ সত্যবাদী ছিলেন। সত্যবাদীদের উত্তম উদাহরণ হজরত আবু বকর (রা.)। মেরাজের রাতের ঘটনার বিষয়ে নবী করিম (সা.) কে সত্য বলায় তাকে নবী (সা.) মহাসত্যবাদী উপাধি দেন। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'হে মুমিনরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।' সুরা তওবা : ১১৯

অপরকে প্রাধান্য : সাহাবিরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের চেয়ে অপরের প্রয়োজন পূর্ণ করার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। এটি তাদের স্বভাবগত অভ্যাস ছিল। অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। সাহাবিরা নিজেদের সব কাজ ও কথায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। শরিয়তের আদেশ-নিষেধের বাইরে কখনো বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা প্রদর্শন করতেন না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য:

[হজরত কাব (রা) অলসতা বশতঃ তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, মদিনায় থেকে যান। বড় একটি হাদিসে তিনি তাঁর ছেলের কাছে ঘটনার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ব্যাখ্যাসহ এখানে তুলে ধরা হল।]

এরপর কাব (রা) বলেন, "রাসূল (স) তাবুকে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আমার কথা মনে করেননি।"

তিনি তাবুকে ক্যাম্প গড়লেন। তিনি কতদিন সেখানে অবস্থান করেন এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ বলেন দশ দিন, কেউ বলেন ঊনিশ দিন। যাইহোক, তিনি বেশ কিছু দিন তাবুকে অবস্থান করেন।

সেই সময় কোন একদিন তাঁর কাবের কথা মনে পড়ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- "কাবের কি হয়েছে।" তখন বনু সালামার এক ব্যক্তি বলে উঠল - কাব নিজেও বনু সালামা গোত্রের, আর এই লোকটিও বনু সালামার - "হে আল্লাহর রসূল! তার সুস্বাস্থ্য ও সম্পদের দু'টি চাদর তাকে আটকে দিয়েছে এবং সেই চাদর দু'টির কিনারায় তাকিয়ে দেখাতে ব্যস্ত রয়েছে।"

এটি আরবি কথা বলার একটি ধরণ। অর্থাৎ, তার উন্নত জামা-কাপড়, আরাম-আয়েশের জীবন তাকে পেছনে ফেলে রেখেছে। অর্থাৎ, তিনি পরকালের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।

তখন মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) ঐ লোকটিকে বললেন - "তুমি কতই না নিকৃষ্ট কথা বললে!" তারপর রাসূলুল্লাহ (স) কে বললেন - "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কাব সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না।" অর্থাৎ আমি তাকে ভালো বলেই জানি।

এখানে যিনি প্রশংসা করলেন তিনি ছিলেন মুয়াজ ইবনে জাবাল, এবং কাব তার নাম উল্লেখ করলেন। কিন্তু যিনি সমালোচনা করেছিলেন কাব (রা) তার নাম গোপন করলেন। আপনাদের কি মনে হয় না, কাব (রা) ভালো করেই জানেন কে তার সমালোচনা করেছিল?

এখানে তাঁর সুযোগ ছিল লোকটার পাল্টা সমালোচনা করার। যেহেতু লোকটি তাঁর নিজ গোত্রের ছিল তিনি নিশ্চয় তার উপর আরও বেশি মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। অন্যদিকে মুয়াজ কিন্তু বনু সালামার ছিল না। অন্য গোত্রের একজন তার প্রশংসা করলো আর নিজ গোত্রের একজন তার সমালোচনা করলো। কিন্তু তারপরেও কাব (রা) ক্ষুদ্রতার উর্ধে উঠে তার সমালোচনা তো করলেনই না, এমনকি তার নাম পর্যন্ত গোপন করলেন। ঘটনা বলার সময় তিনি শুধু বললেন, বনু সালামার এক ব্যক্তি।
সাহাবীরা এভাবে কারো ত্রুটি বর্ণনা করার প্রয়োজন হলে কৃত ব্যক্তির নাম গোপন রেখেছেন। এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রা) দের উচ্চ মানের চরিত্রের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ

কুরআনের সাথে সাহাবায়ে কেরামের কেমন সম্পর্ক ছিল, বিশেষত কুরআনের অনুসরণ ও তার হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ কী ছিল- এককথায় আমরা যদি তা প্রকাশ করতে চাই, তাহলে বলতে হবে, সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন سَمِعْنا وأَطَعْنَا (নির্দেশ শুনেছি এবং মান্য করেছি)- এ আয়াতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

কুরআনের অনুসরণ ও এর বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে, কুরআনের বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে গোমরাহি থেকে রক্ষা করবেন এবং আখেরাতের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰي

অর্থ: "যে আমার পথনির্দেশক কিতাবের অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট কিংবা হতভাগা হবে না।" -সূরা ত্বহা (২০) : ১২৩

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কুরআনঅনুসারীদের ব্যাপারে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তারা দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট এবং আখেরাতে বিফল হবে না। (বরং উভয় জাহানে সৌভাগ্য ও সফলতা লাভ করবে)। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৬০৩৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩০৫৭৫

আবু হাসীন রাহ. বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে এসে বলল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, ঠিক আছে শোনো। প্রথম নসীহত হল, এক আল্লাহর ইবাদত করবে।তাঁর সাথে কখনো কাউকে শরীক করবে না। দ্বিতীয় নসীহত হল, কুরআনকে নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবে (এবং যে অবস্থায় কুরআনের যে হুকুম), তা চোখ বুজে মাথা পেতে নিবে। তৃতীয় নসীহত হল, তোমার কাছে যখন কোনো কল্যাণকর ও সত্য কথা পৌঁছবে, তখন বার্তাবাহক ছোট কিংবা বড় যেমনই হোক না কেন তা গ্রহণ করে নিবে। আর কেউ যদি ভুল কিংবা মিথ্যা কথা পৌঁছায়, তাহলে সে তোমার বন্ধু কিংবা আত্মীয় হলেও সাথে সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে দিবে। -ফাজায়েলে কুরআন, আবু উবায়দ ১/২৫৯

লক্ষ্য করুন, এ দুইটি রেওয়ায়েতে একটি বিষয়ই যৌথভাবে বিবৃত হয়েছে। তা হল, এই মহান দুই সাহাবীর প্রত্যেকেই নসীহত করার সময় কুরআনকে নিজের জীবনের পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। কুরআনের আলোয় আলোকিত হওয়ার এবং তারই রঙে জীবনকে রঙিন করার জোর তাকিদ দিয়েছেন। যার দ্বারা বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামের নিকট পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রকৃত সাফল্যের একমাত্র পথ হল, কুরআনকে আঁকড়ে ধরা এবং তার পূর্ণ আনুগত্য।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন,
কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে দেয় (অর্থাৎ শুধু তার তিলাওয়াত শুনে প্রশংসা শুরু করে দিও না) বরং দেখো, সে কুরআন অনুযায়ী আমল করে কি না। -ছহীহুত তারগীব ওয়াততারহীব, পৃ. ৫৮

মোটকথা, কুরআনে কারীমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হক হল, কুরআন অনুযায়ী আমল করা। কুরআনের আদর্শে জীবন গড়া। সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের এ হক আদায়ে এবং এ দাবি পূরণে স্থাপন করেছেন অতুলনীয় দৃষ্টান্ত । যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মেরজন্য রয়েছে আত্মার খোরাক ও উত্তম আদর্শ।

বস্তুত সাহাবায়ে কেরামের কুরআনী জীবনের দিকে তাকালে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, কুরআনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁদের উপমা হল এমন রোগীর মত, যে চিকিৎসার জন্য কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছে। ডাক্তার তাকে রোগ অনুযায়ী একটি প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। যাতে কিছু ওষুধ ব্যবহার করতে এবং কিছু জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। প্রশ্ন হল, এ প্রেসক্রিপশনের সাথে রোগীর আচরণ কেমন হবে? উত্তর একেবারেই স্পষ্ট। এ রোগী ব্যক্তিটি যেহেতু সুস্থতা লাভ করতে চাচ্ছে এবং ডাক্তারের উপর তার আস্থাও আছে, তাই ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন লেখে দিয়েছে, যে বিধিনিষেধ বেধে দিয়েছে সে তা পরিপূর্ণরূপে মেনে চলবে। কারণ এ ব্যাপারে তার পূর্ণ আস্থা আছে যে, ডাক্তারের দিকনির্দেশনা মেনে চলার মাঝেই তার সুস্থতা নিহিত।
এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রকৃত মুমিনদের গুণ এভাবে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَي اللهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

অর্থ: "ঈমানদারদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের কথা এ-ই হয় যে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আর এরাই তো সফলকাম।"-সূরা নূর (২৪) : ৫১

অর্থাৎ একজন প্রকৃত মুসলমানের গুণ হল, যখন কোনো ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ডাক আসে, তখন সে এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে سَمْعًا وطَاعَةً (‘শ্রুত আদেশ শিরোধার্য’) বলে সাথে সাথে সেই ডাকে সাড়া দিতে এবং হুকুম মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে

যায়। এতেই রয়েছে তার মঙ্গল, কল্যাণ ও প্রকৃত সাফল্য। (ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃ. ৪৭৬, উপরোল্লিখিত আয়াত সংশ্লিষ্ট তাফসীরী হাশিয়া)

কিবলা পরিবর্তনের সংবাদ পেয়ে নামাযের মধ্যেই বাইতুল্লাহর দিকে ঘুরে যাওয়া-

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে যখন মদীনায় গেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার হুকুমে প্রথম ষোলো-সতের মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরেই নামায আদায় করেন। তবে নবীজীর দিলের তামান্না ছিল, বাইতুল্লাহ যেন হয় কেবলা। অবশেষে আল্লাহ তাআলা নবীজীর দিলের তামান্না পূরণ করে বাইতুল্লাহকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করার হুকুম নাযিল করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

قَدْ نَرٰي تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ

অর্থ: "নিশ্চয় আমি আপনার মুখ বার বার আকাশের দিকে উঠতে দেখছি। সুতরাং আমি অবশ্যই আপনাকে সেই কেবলার দিকে ফিরিয়ে দেব, যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব, এখন আপনি স্বীয় মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরান।" -সূরা বাকারা (২) : ১৪৪

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, কেবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল হওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছরের নামায বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে আদায় করেন। নামাযের পর এক সাহাবী বাইরে বেরিয়ে দেখেন, এক মসজিদে লোকজন আগের মতো বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকেই মুখ করে নামায আদায় করছে।

তিনি তখন আওয়াজ দিয়ে বললেন, বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম নাযিল হয়েছে। আমি এখনই নবীজীর সাথে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়ে এসেছি। মুসল্লিরা তখন রুকু অবস্থায় ছিল। ঘোষণা শোনামাত্র সে অবস্থায়ই তাঁরা বাইতুল্লাহর দিকে ঘুরে যান। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৪৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫২৫; তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/১০৭-১০৮

হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, কুফাবাসীদের কাছে পরের দিন ফজরের নামাযের সময় এ সংবাদ পৌঁছে। তাঁরাও তখন নামাযরত অবস্থায় বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে নেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫২৬; তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/১০৯-১১০

কুরআন মাজীদে কেবলা পরিবর্তনের হুকুমের একটি হেকমত এটাও বলা হয়েছে-
لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰي عَقِبَيْهِ ۭ

অর্থাৎ, "যাতে আমি জানতে পারি যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে পেছনের দিকে ফিরে যায় (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে)।" -সূরা বাকারা (২) : ১৪৩
এটা তো জানা কথা, এ ধরনের পরীক্ষায় সাহাবায়ে কেরাম সবসময়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন। তবে এ ঘটনায় যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল, সাহাবায়ে কেরাম নামাযের মধ্যে যে অবস্থায় ছিলেন, হুকুম শোনামাত্র সে অবস্থায়ই বাইতুল্লাহর দিকে ঘুরে যান। তাদের এ কথা ভাবারও তো সম্ভাবনা ছিল যে, এ নামাযটি বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরেই শেষ করি। পরবর্তী নামায থেকে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করব। কিন্তু কুরআনের আদেশ পালনে নিবেদিতপ্রাণ সেসব মনীষীদের এতটুকু বিলম্ব কীভাবে সহ্য হতে পারে! তাঁদের জীবনে এমনই ছিল "سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا"-এর বাস্তবায়ন।

মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্যের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

কুরআন মাজীদে মদের ব্যাপারে একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে সূরা মায়েদার এ আয়াতগুলো-
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ [٩٠] اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ[٩١]

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, পূজার বস্তু ও জুয়ার তীর- (সবই) অপবিত্র, শয়তানের কাজ। অতএব এসব থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান এ-ই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখবে। অতএব তোমরা কি (তা থেকে) বিরত হবে?" -সূরা মায়িদা (৫) : ৯০-৯১

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে মদ হারাম হওয়ার ঘোষণা করে মদ থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে। আরবে তখন মদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যুগ যুগ ধরে মদ তাদের সমাজ-সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু মদ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম এ বিধানের প্রতি আনুগত্যের যে বিরল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, ইতিহাসে এর কোনো নজির পাওয়া যাবে না।

ওপরের আয়াতগুলোর শেষে হয়েছে- فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون (তোমরা কি মদপান থেকে বিরত হবে?) হযরত ওমর রা. আয়াতটি শোনামাত্রই বলে উঠলেন, اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا 'হাঁ, হাঁ, আমরা বিরত হলাম। আমরা বিরত হলাম।' -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৩৭৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭০

হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, এক মজলিসে কিছু সাহাবী মদের পেয়ালায় ঠোঁট লাগিয়েছেন, ঠিক এমন সময় তাদের কাছে মদ হারাম হওয়ার সংবাদ পৌঁছল। সাথে সাথে তাঁরা মদের পেয়ালা দূরে নিক্ষেপ করলেন, আর فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون-এর জবাবে বলে উঠলেন, اِنْتَهَيْنَا رَبَّنَا (অর্থাৎ আমরা বিরত হয়ে গেছি হে আমাদের প্রতিপালক) -তাফসীরে তাবারী ১০/৫৭২; তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৩৪৫

★হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থসমূহে এ ধরনের আরো অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

আয়াতটি শোনামাত্র ওমর রা.-এর মাথা নত করে দেয়া।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, হযরত ওমর রা.-এর খেলাফতের সময় একবার উয়াইনা ইবনে হিস্ন মদিনায় এসে তার ভতিজা হুর ইবনে কায়েসের নিকট অবস্থান করল। হুর ইবনে কায়েস ছিলেন ওমর রা.-এর মজলিসে শুরার একজন সদস্য। সাধারণত কুরআনের হাফেজ-আলেমগণই ওমর রা.-এর মজলিসে শুরার সদস্য হতেন। একদিন উয়াইনা হুর ইবনে কায়েসকে বলল, তুমি তো আমিরুল মুমিনের কাছের মানুষ। তাঁর সাথে একটু সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও! হুর ইবনে কায়স তখন ওমর রা.-কে অনুরোধ করলে তিনি উয়াইনাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেন। ওমর রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করা মাত্রই উয়াইনা বলে উঠল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি না আমাদেরকে প্রাপ্য অধিকার দেন আর না আমাদের সাথে ইনসাফ ও ন্যায়সম্মত আচরণ করেন। এ কথা শুনে ওমর রা. অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তখন হুর ইবনে কায়স বলল, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অর্থ: "ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চল।" -সূরা সাজদা (৩২) : ১৬

আর এ ব্যক্তিও মুর্খদের অন্তর্ভুক্ত। তাই আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী এর কথা উপেক্ষা করুন। এ আয়াত শোনামাত্র ওমর রা. একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। উয়াইনাকে কিছুই বললেন না। কারণ তিনি যে ছিলেন وَقّافٌ عِنْدَ كِتَابِ الله (আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে পূর্ণ সমর্পিত একজন মানুষ।) -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৬৪২.

আহলে বাইত

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্মান ও ভালবাসার অংশ তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মান করা ও ভালবাসা। তাঁর সাহাবীগণকে, তাঁর পরিবার ও বংশধরদেরকে, তাঁর উম্মাতকে, তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে এবং তাঁর সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তাঁর কারণে সম্মান করা ও ভালবাসা তাঁরই সম্মান ও ভালবাসার অংশ। বিশেষত তাঁর সাহাবী ও আহল বাইতের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। এখানে কোনো বংশ বা বর্ণের 'অলৌকিকত্ব বা পবিত্রতা ঘোষণা করা হয় নি। ইসলামে মর্যাদার ভিত্তি তাকওয়া; বংশ বা রক্ত নয়। কুরআনে বংশ, বর্ণ বা দেশ নির্বিশেষে সকল সাহাবীর প্রশংসা করা হয়েছে তাঁদের কর্ম ও ত্যাগের কারণে, বংশ বা বর্ণের কারণে নয়। আর স্বভাবতই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশের যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন সকলেই এ প্রশংসা ও মর্যাদার মধ্যে শামিল হয়েছেন। কাজেই পৃথকভাবে ''নবী-বংশের মর্যাদার উল্লেখ করা হয় নি।

কুরআনে 'আহল বাইত দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। একস্থানে ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রীকে ফিরিশতারা ''আহল বাইত বলে সম্বোধন করেন।[1] অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

‘হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে। আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে আহল বাইত (নবী-পরিবার)! আল্লাহ্ তো শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।’’[2]

এখানে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীগণকে ‘‘আহল-বাইত বা ‘‘নবী-পরিবার বলে সম্বোধন করে তাঁদের পরিপূর্ণ পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু ‘‘আহল-বাইত বিষয়ে শীয়াগণের বিশ্বাস কুরআনের এ ঘোষণার সাথে সাংঘর্ষিক। তারা নবী-পত্নীগণকে ‘‘আহল বাইত’’ বলে স্বীকার করেন না। উপরন্তু তাঁদের বিষয়ে তারা অত্যন্ত অশস্নীল ও নোংরা ধারণা পোষণ করেন।

শীয়াগণ মূলত আহল বাইত বলতে ‘‘আলী-বংশ’’ বুঝান। আর এ বিষয়ে কুরআন কারীমে কোনো নির্দেশনা নেই। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

বল, ‘আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না।[3]

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে দীন প্রচারের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাচ্ছি না। তবে তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তা রয়েছে সে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ও ভালবাসার দাবি যে, তোমরা আমাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকবে এবং আমার সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করবে। আমি তোমাদের কাছে এ সৌহার্দ্যটুকু দাবি করছি।

কারো কারো মতে এ আয়াতের অর্থ: ‘আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, শুধু আমার আত্মীয়দের প্রতি তোমাদের সৌহার্দপূর্ণ আচরণ চাই।’অর্থাৎ এখানে তাঁর আত্মীয়দের ভালবাসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ অর্থ কুরআনের স্বাভাবিক বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানে তিনি 'আত্মীয়তার সৌহার্দ্য' দাবি করেছেন, 'আত্মীয়দের প্রতি বা আত্মীয়দের জন্য সৌহার্দ্য' দাবি করেননি। এছাড়া তাঁর আত্মীয়দের অধিকাংশই সে সময়ে কাফির ছিলেন এবং তাদের সাথে অন্যান্য কাফির সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতো। উপরন্তু তিনি মক্কার যে কাফিরগণকে এ কথা বলেছিলেন তারাই তো তাঁর আত্মীয় ছিলেন। কাজেই তাদের কাছে তিনি কিভাবে তাঁর আত্মীয়দের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ আচরণ দাবি করবেন।

এদ্বারা তাঁর আত্মীয়দের অবমূল্যায়ন বা অবমর্যাদা উদ্দেশ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ভালবাসা ঈমানের স্বাভাবিক দাবি। তাঁর পরিবার ও বংশধরের প্রতি ভালবাসা তাঁরই ভালবাসার অংশ। তাঁর বংশের যারা ঈমান ও সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের মর্যাদাও কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা। এ মর্যাদার পাশাপাশি আত্মীয়তার মর্যাদা তাঁদেরকে মহিমান্বিত করে। সর্বোপরি হাদীসে তাঁদের মর্যাদার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

যাইদ ইবন আরকাম (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম' নামক স্থানে আমাদের মাঝে বক্তৃতা করেন। তিনি আল্লাহর গুণগান করলেন, ওয়ায করলেন ও উপদেশ প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন:

أَمَّا بَعْدُ أَلا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ... ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي... ثلاثا.

"হে মানুষেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি একজন মানুষ মাত্র। হয়ত শীঘ্রই আমার প্রভুর দূত এসে পড়বেন এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। আমি তোমাদের মধ্যে দুটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি। প্রথমত আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথের দিশা ও আলো। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। .... এরপর তিনি বললেন : 'এবং আমার বাড়ির মানুষ (আহল বাইত)। আমি আমার 'আহল বাইত' বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে রাখতে উপদেশ প্রদান করছি।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন।"[4]

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أَحِبُّوا اللَّهَ (لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ) وَأَحِبُّونِي (بِحُبِّ اللَّهِ) وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي (بِحُبِّي(

"তোমরা আল্লাহকে ভালবাসবে কারণ তিনি তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামত প্রদান করেন, এবং আল্লাহর ভালবাসায় আমাকে ভালবাসবে এবং আমার ভালবাসায় আমার 'আহল বাইত' বা বাড়ির মানুষদের (বংশধর ও আত্মীয়দের) ভালবাসবে।"[5]

1] সূরা (১১) হূদ: ৭৩ আয়াত।
[2] সূরা (৩৩) আহযাব: ৩২-৩৩ আয়াত।
[3] সূরা (৪২) শূরা: ২৩ আয়াত।
[4] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৭৩ (কিতাব ফাযাইলুস সাহাবা, বাবুন মিন ফাযাইল আলী)
[5] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৬৬৪ (কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যি); হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/১৬২। হাদীসটিকে তিরমিযী হাসান এবং হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।

নারী সাহাবিদের অবদান

ইসলাম প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। এর মাধ্যমে অনেক মানুষ হেদায়াত পায়। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলাম প্রচার করা প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত কর্তব্য।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও অন্যের কাছে পৌঁছে দাও। (বুখারি, হাদিস : ৩২১৫)
যুগে যুগে ইসলাম প্রচারে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা ছিলেন ঘরের ভেতরে আলোকবর্তিকা আর প্রয়োজনে মাঠের বীরাঙ্গনা। ইসলাম প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় তাঁদের অবদান ও আত্মত্যাগ কোনোভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই।

ইসলাম গ্রহণে নারীর অবস্থান

রাসুলুল্ (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকে তাঁর নিকটাত্মীয় এবং পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাঁদের মধ্যে খাদিজা (রা.) প্রথম ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে তিনি প্রথম নামাজ আদায় করেন। তিনি প্রথম কিবলার অনুসারী ছিলেন।

এরপর পর্যায়ক্রমে ওরাকা ইবনে নওফেল (রা.), আলী (রা.), জায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) এবং আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামের ছায়াতলে আসেন। (সিরাতুল মুস্তফা : ১/১৩৭)
খাদিজা (রা.) শুধু সর্বপ্রথম ইসলামই গ্রহণ করেননি, বরং এর বহু আগে থেকেই তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সাহস, মানসিক শক্তি ও আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রথম ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরে এসে খাদিজা (রা.)-কে বলেন, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। এরপর সব ঘটনা শুনে খাদিজা (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারি করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।
(বুখারি, হাদিস : ৩)

সুতরাং তিনি ছিলেন একাধারে প্রিয়তমা স্ত্রী, সমর্থক এবং সহযোগী ইসলাম প্রচারক।

ইসলাম গ্রহণে নারীদের বায়াত

নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো বায়াত বা আনুগত্যের অঙ্গীকার। ইসলাম পুরুষের পাশাপাশি নারীর জন্যও দায়িত্ব, কর্তব্য ও নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছে। এর প্রমাণ মেলে ইসলামের সূচনালগ্নেই নারীদের বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রথম বায়াত নবুওয়াতের দশম বছরে হজের মৌসুমে সংঘটিত হয়। তখন মদিনার ছয়জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ঈমান ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এটাই ছিল আকাবার প্রথম শপথ। নবুওয়াতের ১৩তম বছর মদিনার ৭৫ জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ৭৩ জন পুরুষ এবং দুজন নারী ছিলেন। এটাই ছিল ইতিহাসে নারীদের প্রথম বায়াত গ্রহণের ঘটনা। নারী দুজনের একজন ছিলেন উম্মে উমারা নুসায়বা বিনতে কাব। দ্বিতীয় জন ছিলেন উম্মে মানী আসমা বিনতে আমর। (ইবনে হিশাম : ১/৪৪০-৪৪১)

ইসলামের প্রথম শহীদ নারী

যুগে যুগে যাঁরা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন সুমাইয়া (রা.)। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবি ইয়াসির (রা.)-এর স্ত্রী ও আম্মার (রা.)-এর জননী। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মক্কার কাফিররা তাঁদের ওপর কঠোর জুলুম নির্যাতন করত। যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আম্মার, তাঁর পিতা ইয়াসির (রা.) এবং তাঁর মা সুমাইয়া (রা.)-কে বিপদগ্রস্ত দেখতেন, তখন বলতেন, হে ইয়াসির পরিবার, সবর কর। কখনো বলতেন, হে আল্লাহ, তুমি ইয়াসির পরিবারকে ক্ষমা করো। আবার কখনো বলতেন, তোমাদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ, তোমাদের আশা পূর্ণ হবে। তাঁদের হৃদয়ে ঈমানের অটল দৃঢ়তা এতটাই ছিল যে, কোনোভাবেই তাঁদের ইসলাম থেকে দূরে সরানো যায়নি। জুলুম-নির্যাতনের এক পর্যায়ে আবু জাহেল বর্শা দিয়ে সুমাইয়া (রা.)-কে আঘাত করে নির্মমভাবে শহীদ করে। এই মহান নারীর রক্তে সিক্ত হয় ইসলামের প্রথম শহীদির ইতিহাস। (সিরাতুল মুস্তফা : পৃ. ১৯৯)

সুমাইয়া (রা.) প্রমাণ করেছেন, একজন নারীর ঈমান ও ত্যাগ কতটা দৃঢ় হতে পারে। তাঁর এই আত্মোৎসর্গ পরবর্তী প্রজন্মের মুমিন নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার বাতিঘর হয়ে আছে।

আসমা (রা.)-এর জীবন থেকে অন্য মুমিন নারীদের জন্য রয়েছে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা।

আত্মত্যাগ

উম্মাহর মহিলা সাহাবীরা (রাঃ) সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ ও তার রসুলকে (সাঃ) ভালোবাসতেন। উহুদ যুদ্ধ মুসলিম ইতিহাসে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা যেখানে বহু সাহাবী শহীদ হন ও রসুলুল্লাহ (সা) আহত হন।

১ম ঘটনা

ইবন ইসহাক বলেন, সাফিয়্যা বিনত আবদুল মুত্তালিব হযরত হামযার (রা) লাশ দেখতে আসেন। হযরত হামযা (রা) ছিলেন তার সহোদর ভাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পুত্র যুবায়র ইবন আওয়ামকে বললেন, তুমি তোমার মায়ের নিকট যাও। তাঁকে থামাও, যেন তাঁর ভাইয়ের হৃদয়বিদারক এই লাশের দৃশ্য তাঁকে দেখতে না হয়।

যুবায়র তাঁর মাকে বললেন, আম্মা! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, কেন? আমি তো জেনেছি যে, আমার ভাইয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে, তাতে কী? তাতো হয়েছে আল্লাহর পথে! আমার জন্য অধিকতর খুশীর ব্যাপার আর কী হতে পারে? আমি অবশ্যই ধৈর্যধারণ করব এবং ছওয়াবের আশায় থাকব ইনশাআল্লাহ্।

যুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে এই সংবাদ জানালেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন: তাঁকে আসতে দাও! সাফিয়্যা (রা) এলেন। হামযা (রা)-কে দেখলেন। তাঁর জন্যে দু'আ করলেন, শোক প্রকাশ করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

আহ কেমন ছিল ঈমান!! কেমন ছিল সবর!!

২য় ঘটনা

ইমাম বুখারী অন্য একস্থানে, ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) এরূপ হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব থেকে। উমাভী বলেন, আমার পিতা হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের যুদ্ধে যাবার পর সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমরা সাহরীর সময় পথে বের হয়ে পড়ি। ইতোমধ্যে ফজরের সময় হয়ে যায় । আমরা জনৈক পাথর বহনকারী লোককে দেখলাম সে দৌড়াচ্ছে আর বলছেঃ

হে হামল ইব্ন সা'দানা! তুমি একটু অপেক্ষা কর, তারপর প্রচণ্ড যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হও। পরে আমরা ভালভাবে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি হলেন উসায়দ ইবন হুযায়র। এরপর আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। হঠাৎ দেখলাম একটি উট এল। উটের পিঠে একজন মহিলা । দুপাশে দুটো বোঝা।

হযরত আইশা (রা) বলেন, আমরা মহিলাটির নিকট গেলাম। তখন দেখতে পাই যে, তিনি আমর ইবন জামূহ এর স্ত্রী। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সংবাদ কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করেছেন। কতক মু'মিন ব্যক্তিকে শহীদরূপে কবুল করেছেন। এবং কাফিরদেরকে মনের জ্বালাসহ বিফল মনোরোথে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। মহিলাটি তার উটকে বসার নির্দেশ দিয়ে নিজে উট থেকে নেমে পড়লেন। আমরা তাঁর বোঝা দুটোর দিকে

ইঙ্গিত করে বললাম, এগুলো কী ? তিনি বললেন, একটি আমার স্বামীর লাশ আর একটি আমার ভাইয়ের লাশ।

৩য় ঘটনা

ইবন ইসহাক বলেন, আবদুল ওয়াহিদ সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বানু দীনার গোত্রের এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলার স্বামী, ভাই ও পিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হয়ে যুদ্ধ করতে করতে উহুদ ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন। ওদের মৃত্যুর সংবাদ তাঁকে শোনানোর পর তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেমন আছেন? লোকজন বলল, হে অমুকের মা! আপনি যেমন কামনা করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্ তিনি ভাল আছেন। তিনি বললেন, তাঁকে একটু দেখান, 'আমি তাঁকে এক নজর দেখে নিই! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইশারা করে তাঁকে দেখানো হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে তিনি বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে সুস্থ দেখার পর সকল বিপদ আমার নিকট তুচ্ছ।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া – ৪র্থ খন্ড, উহুদ যুদ্ধ)

আহ! আমাদের এমন সময় ছিল উম্মাহর মায়েরা স্বপ্ন দেখতেন তাদের বাবা, ভাই, সন্তান আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে এটাই ছিল তাদের বিজয়। ফলে তারা পেয়েছিলেন রসুল (সাঃ) ও সাহাবিদের সাথে জান্নাতের সুসংবাদ।

ইসলাম ও রসুল (সাঃ) নিয়ে ছিল তাদের মূলত সুখ, দুঃখ পেরেশানি। আজ এমন মা আছে যারা সন্তানকে দুনিয়ায় সমৃদ্ধ দেখতে সাগর পথে মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে বিদেশ পাঠাতে আগ্রহী থাকে বা বড় ক্রীড়াবীদ, তারকা বানানোর জন্য শিশু বয়সে বহু কষ্ট ও ঝুঁকি নেয়। অথচ এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে যে সন্তান, স্বামী হয়তো রসুলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ মানতে চাইছে (দাড়ি রাখা, হারাম বর্জন) নারীরা বাঁধা হয়ে উঠছে।

যদি সত্যি সন্তান, ভাই, স্বামীদের কল্যান চান- রসুলের (সাঃ) মহিলা সাহাবিদের মত আল্লাহ, তার রসুল (সাঃ) ও দ্বীনকে ভালোবাসুন তাহলে আজীবন পরিবার নিয়ে জান্নাতে থাকতে পারবেন নয়তো পথভ্রষ্ট হবেন।

আল্লাহ বলেন-

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰي يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

অর্থ: “বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।” (সুরা তওবা-২৪)

সাহাবাদের ইখলাস ও আনুগত্য

وَّعَلَي الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۭ حَتّٰٓي اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۭ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থ: "আর তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যে এটা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্যে দুর্বিষহ হয়েছিল আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত, পরে তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন যাতে তারা তওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবা: ১১৮)

এ তিনজন সাহাবী ছিলেন কায়াব ইবনে মালিক রা., হিলাল ইবনে উমাইয়া রা. এবং মুরারা ইবনে রুবাই রা.। এরাঁ তিনজনই ছিলেন সাচ্চা মুমিন। এর আগে বহুবারই তাঁরা তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছেন। ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করেছেন। শেষোক্ত দু'জন সাহাবী তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর বদরের সাহাবীগণের ঈমানী নিষ্ঠা ও সততা তো সর্বপ্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে। আর প্রথমোক্ত সাহাবী যদিও বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন না, কিন্তু বদর ছাড়া বাকি সকল যুদ্ধেই রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এসব মহান খিদমত সত্ত্বেও এ নাজুক সময় তাদের গাফলতি প্রকাশ হয়ে পড়ে। যখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণে যোগ্য সকল ঈমানদারকেই যুদ্ধে রওয়ানা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তার জন্যে তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হলো। তাবুক থেকে ফিরে এসে রসূলুল্লাহ সা. মুসলমানদের নির্দেশ প্রদান করেন, কেউ যেনো তাদের সাথে সালাম কালাম না করে। চল্লিশ দিন পর তাদের স্ত্রীগণকেও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। বাস্তবিক পক্ষে মদিনার সেই জনবসতিতে তাদের অবস্থা ঠিক তাই হয়ে যায়, যার চিত্র এ

আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। অবশেষে যখন তাদেরকে বয়কট করার মেয়াদ পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হলো, তখন তাদের ক্ষমা করে দেয়ার এ হুকুম নাযিল হয়।

এ তিনজনের মধ্যে কায়াব ইবনে মালিক তাঁর কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এ কাহিনী বাস্তবিকই চরম শিক্ষাপ্রদ। বৃদ্ধাবস্থায় যখন তিনি অন্ধ হয়ে পড়েন, তখন পুত্র আবদুল্লাহর নিকট যে তাঁকে হাতে ধরে চলাফেরা করাতো স্বয়ং এ কাহিনী বর্ণনা করেন: "তবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রাক্কালে যখনই রসূলুল্লাহ সা. মুসলমানদেরকে যুদ্ধ যাত্রার আহবান জানাতেন, আমি মানসিকভাবে যুদ্ধ যাত্রার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হতাম। ঘরে ফিরে এলে মন আড়ষ্ট হয়ে পড়তো। তখন মনে মনে বলতাম, অসুবিধা কি, যাত্রার সময় হলে প্রস্তুতি নিতে আর সময় লাগবেনা। এভাবে ব্যাপারটি বিলম্বিত হতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো সৈন্যদের যাত্রার সময় উপস্থিত আর আমি তখনো অপ্রস্তুত। মনে মনে বললাম, সেনাবাহিনী অগ্রসর হোক, আমি দুয়েকদিন পর পথে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই গাফলতি ও আড়ষ্টতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো আর এদিকে তাঁদের সাথে মিলিত হবার সময় ফুরিয়ে গেলো। মদিনায় অবস্থানের এই দিনগুলোতে এ অবস্থা দেখে আমার মনে চরম আঘাত লাগছিল যে, আমি যাদের সাথে এখানে রয়ে গেছি তারা হয় মুনাফিক না হয় সেই দুর্বল অক্ষম লোক যাদেরকে আল্লাহ মাযুর করে রেখেছেন।

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করে রসূলুল্লাহ সা. তাঁর নিয়ম মাফিক প্রথমে মসজিদে এসে দু'রাকাআত নামায পড়েন। অত:পর লোকদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে বসে পড়েন। মুনাফিকরা এ মজলিসে এসে কসম খেয়ে নিজেদের দীর্ঘ লম্বা ওযরের ফিরিস্তি পেশ করতে থাকে। এদের সংখ্যা ছিলো আশিরও অধিক। নবীপাক সা. তাদের প্রত্যেকের মনগড়া কথাবর্তা শুনেন এবং তাদের বাহ্যিক ওযরকে তিনি গ্রহণ করেন আর মূল ব্যাপার আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বলেন: আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। অত:পর আমার পালা আসলো। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আমি সালাম দিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি মুচকি হেসে বললেন "এসো, কোন্ জিনিস তোমাকে বাধা দিয়েছিল?" আমি আরয করলাম "আল্লাহর শপথ! আমি দুনিয়ার কোনো মানুষের সামনে দন্ডায়মান থাকলে অবশ্যই কোনো না কোনো কথা বানিয়ে নিয়ে তাকে রাজি করার চেষ্টা করতাম। মনগড়া কথাতো কতোই বলা যায়। কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমার ইয়াক্বীন ও দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে, এখন কোনো মনগড়া ওযর পেশ করে আপনাকে যদি সন্তুষ্ট করে নিইও,তবু অবশ্যই আল্লাহ আমার প্রতি আপনাকে অসন্তুষ্ট করে দেবেন। হ্যাঁ, যদি সত্যি কথা বলি, তবে আপনি অসন্তুষ্ট হলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করার কোনো না কোনো ব্যবস্থা করবেন।"

"প্রকৃত ঘটনা হলো, আপনার কাছে পেশ করার মতো আমার কোনো ওযর নেই। যুদ্ধে যেতে আমি পুরোপুরি সক্ষম ছিলাম।"

একথা শুনে রসূলুল্লাহ সা. বললেন, "এ ব্যক্তিই সত্য কথা বলেছে। আচ্ছা এখন যাও, তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

আমি উঠে আমার কবিলার মধ্যে চলে এলাম। এখানে সকলেই আমার পেছনে লেগে গেলো। আমি কেন কোনো ওযর পেশ করলাম না সেজন্যে তারা আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। এসব কথা শুনে আমার মনেও কিছুটা ইচ্ছা জাগলো যে, গিয়ে রসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে কোনো একটা মনগড়া ওযর পেশ করি। কিন্তু আমি যখন অবগত হলাম, আরো দুজন নেক লোক (মুরার ইবনে রবাঈ এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া) ও আমারই মতো সত্য কথা বলেছেন, তখন আমি আশ্বস্ত হলাম এবং সত্যের উপর অটল হয়ে পড়ে থাকলাম।

অতপর রসূলুল্লাহ সা. সাধারণ নির্দেশ প্রদান করলেন, আমাদের তিনজনের সংগে কেউ যেনো কথা না বলে। তাঁরা দুজনে ঘরে পড়ে থাকলেন। কিন্তু আমি বাইরে বেরুতাম। নামাযের জামাতে শরীক হতাম। বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কেউ আমার সাথে কথা বলতোনা। মনে হচ্ছিলো, পৃথিবীটা যেন বদলে গেছে। এখানে আমি অপরিচিত। কেউ আমাকে চেনেনা। মসজিদে নামায পড়তে যেতাম। যথারীতি রসূলুল্লাহ সা. কে সালাম করতাম। জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ে কিনা সেজন্যে অপেক্ষা করতাম। নামায অবস্থায় চুপিসারে দেখতাম, রসূলুল্লাহ সা. আমার প্রতি তাকাতেন। যেই সালাম ফেরাতাম, তিনি তাঁর দৃষ্টি অন্য দিকে নিয়ে যেতেন। হতাশ হয়ে একদিন চাচাতো ভাই ও ছোট বেলার বন্ধু আবু কাতাদার নিকট গেলাম। তার বাগানের দেয়ালের উপর উঠে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু সেই আল্লাহর বান্দাহ সালামের জবাব পর্যন্ত দিলনা। আমি বললাম: আবু কাতাদা, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি: আমি কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মহব্বত করিনা? সে চুপ থাকলো। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম। সে চুপ থাকলো। তৃতীয়বার যখন আমি কসমদিয়ে একই প্রশ্ন করলাম, তখন সে কেবল এতোটুকু বললো: "আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন।" তার জবাব শুনে আমার চোখের পানি গড়িয়ে পড়লো। দেয়াল থেকে নেমে চলে এলাম। এ সময় একদিন বাজারে গেলাম। সিরিয়ার নিকটবর্তী গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। সে রেশমের কাপড়ে আবৃত গাসসানের রাজার পাঠানো একখানা চিঠি আমাকে দিলো। খুলে পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে: "আমরা শুনলাম তোমার কর্তা নাকি তোমার উপর চরম যুলুম করছে। কিন্তু তুমি তো কোনো অবহেলার পাত্র নও। তুমি এমনটিও নও যে তোমাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া যেতে পারে। তুমি আমাদের কাছে এসে যাও। আমরা তোমাকে মর্যাদা দান

করবো।" চিঠি পড়ে আমি বললাম আমার প্রতি আরেকটা পরীক্ষা নাযিল হলো।" সাথে সাথে চিঠিটা চুলায় ঢুকিয়ে দিই ছাই করে ফেললাম।

এভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলো রসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশে এক লোক এসে আমাকে বলে গেলো, তোমার স্ত্রীর নিকট থেকে পৃথক থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম "তালাক দিয়ে দেবো কি? জবাব পেলাম শুধু পৃথক থাকো।" সুতরাং স্ত্রীকে বললাম তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও এবং আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকো।"

পঞ্চাশতম দিন ফজরের নামাযের পর স্বীয় ঘরের ছাদে বসে আছি। নিজেকে নিজে তিরস্কার করছি। সহসা এক ব্যক্তি চিৎকার করে বললো: "কায়াব ইবনে মালিক মুবারকবাদ"। শুনেই আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, আমাকে ক্ষমা করে দেয়ার নির্দেশ হয়েছে। এর পর দলে দলে লোক আসতে থাকলো। প্রত্যেকই অপরের আগে মুবারকবাদ দিতে থাকলো। তারা বলছিলো, “তোমার তওবা কবুল হয়েছে।" আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা করলাম। দেখলাম রসূলুল্লাহ সা.-এর মুখমন্ডল আনন্দে উজ্জ্বল। আমি সালাম করলাম। তিনি বললেন "তোমাকে মুবারকবাদ। আজকের এদিন তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন"। আমি আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ, এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে?" তিনি বললেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং সাথে সাথে এ (সুরা তওবা: ১১৮) আয়াতটি শুনিয়ে দিলেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার সমস্ত ধন সম্পদ আল্লাহর পথে সদকা করে দেয়াও আমার তওবার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তিনি বললেন: কিছু রেখেদেয়াটাই তোমার জন্যে উত্তম হবে।" তার হুকুম মোতাবেক খায়বরের অংশটা রেখে বাকি সব সম্পদ দান করে দিলাম। অতপর আল্লাহর সাথে ওয়াদা করলাম: যে সত্যবাদিতার জন্যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন, আমি গোটা জীবন সেই সত্যের উপর অতিবাহিত করবো।" অতপর জেনে বুঝে আজ পর্যন্ত আমি সত্যের বিপরীত কথা বলিনি। আল্লাহর নিকট এ আশা পোষণ করি যে, ভবিষ্যতেও তিনি আমাকে অসত্য থেকে রক্ষা করবেন।"

এ কাহিনীতে অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রত্যেক মুমিনের অন্তরেই বদ্ধমূল করে নেয়া উচিত।

প্রথমত, এ থেকে জানা গেলো, কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বের বিষয়টি কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক? এ দ্বন্দ্বে কুফরকে সমর্থন করা তো দূরের কথা, ইসলামের সাহায্য সহযোগিতা করার ব্যাপারে অসৎ নিয়্যতে নয়, নেক নিয়্যতেই গোটা জীবনেও যদি কারো একবার ত্রুটি হয়ে

পড়ে তবে তার গোটা জীবনের ইবাদাত-বন্দেগী ও দীনদারী বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমনকি বদর, ওহুদ, খন্দক ও হুনাইনের মতো কঠিন যুদ্ধ সমূহে যারা জীবন বাজীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন এবং যাদের ঈমান ও ইখলাসে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিলো না- সেসব মহান ব্যক্তিরা পর্যন্ত পাকড়াও থেকে রেহাই পাননি।

দ্বিতীয়ত, দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। বরঞ্চ অনেক সময় মানুষ কেবল অবহেলা অলসতার কারণে এমন সব অপরাধ করে বসে, যা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। তখন সে অসৎ নিয়্যতে এ অপরাধ করেনি বলে পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে পারেনা।

তাছাড়া এ কাহিনী রসূলুল্লাহ সা.-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রাণসত্তা বড় সুন্দর ভাবে আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়। একদিকে মুনাফিকদের সর্বজন জ্ঞাত গাদ্দারী। তা সত্ত্বেও তাদের বাহ্যিক ওযর গ্রহণ করা হয় এবং ক্ষমা করে দেয়া হয়। কারণ তাদের থেকে তো কখনো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা পাওয়া যায়নি। সুতরাং এখন তাদের বিরুদ্ধে সে জিনিসের অভাবের অভিযোগ তোলার কোনো অর্থই হয়না। অপরদিকে রয়েছেন কষ্টিপাথরের পরীক্ষিত মুমিনগণ, যাদের ত্যাগ, কুরবানী ও আত্মদান সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে। তারা মিথ্যা মনগড়া কথা বানিয়ে বলেননা। অকপটে স্পষ্টভাষায় নিজেদের দোষ স্বীকার করে নেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি ক্রোধাগ্নি বর্ষিত হয়। ব্যাপার এমনটি নয় যে, তাদের মুমিন হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ আছে। বরঞ্চ এর একমাত্র কারণ হলো, তাঁরা মুমিন হয়েও কেন একাজ করলেন যা কেবল মুনাফিকরাই করতে পারে?

এ আচরণের কারণ এ ছিলো যে, যমীনের সারবস্তু তো এরাই। আর তারাই যদি সার হবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তবে আর সার পাওয়া যাবে কোথায়? লক্ষণীয় বিষয় হলো, গোটা ব্যাপারটিতে সমাজ নেতা কিভাবে অভিযুক্তদের শাস্তি দান করেছেন আর পরিচালিতরা কি গভীর আনুগত্য ও বিনয়ের সাথে তা মাথা পেতে নিচ্ছেন। গোটা সমাজ পূর্ণ সহযোগিতার সাথে সে শাস্তি কার্যকর করছে। বিষয়টির প্রতিটি দিকই অনুপম। এ ব্যাপারে কে অধিক প্রশংসা পাবার যোগ্য তা নির্ণয় করা কঠিন। নেতা চরম কঠিন শাস্তি প্রদান করছেন, কিন্তু ঘৃণা ও বিদ্বেষের লেশমাত্র সেখানে নেই। বরঞ্চ অপরিসীম মহব্বত ও ভালবাসার সাথেই তিনি একাজ করছেন। যেনো পিতার অগ্নিবর্ষক দৃষ্টি প্রতিমুহূর্তেই তাকে বলে যায় তোমার সাথে কোনো দুশমনী নেই। তোমার অপরাধের জন্যেই তোমার প্রতি আমার মনে ভীষণ দুঃখ। তুমি নিজেকে শুধরে নাও। এ হৃদয় তোমাকে সাদরে বুকে তুলে নেবার জন্যে আনচান করছে। কিন্তু আনুগত্যের পদযুগল মুহূর্তের জন্যে বিচলিত হয়না। শুধু তাই নয় নফসের

অহংকার আর জাহিলিয়তের বিদ্বেষী হটকারিতা তার অন্তরে জেগে উঠেনা। প্রকাশ্য বিদ্রোহ তো দূরের কথা, নিজের প্রিয়তম নেতার বিরুদ্ধে বিন্দু মাত্র অভিযোগ মনের কোণে উদয় হয়না। বরঞ্চ তাঁর প্রতি ভালবাসায় হৃদয় অধীর হয়ে উঠে। শাস্তির পুরো পঞ্চাশটি দিন কেবল নেতার স্নেহদৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ হয় কিনা আশার এই শেষ পুরো প্রদীপটির প্রতিই বারবার উদগ্রীব দৃষ্টি ছুটে যায়। এ যেনো এক দুর্ভীক্ষ পীড়িত চাষী যার দৃষ্টি অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে কেবল দুরাকাশের একখন্ড মেঘপুঞ্জের দিকে।

অন্যদিকে গোটা দলটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তার ডিসিপ্লীন, তার নৈতিক পবিত্রতার স্পিরিট দেখে মানুষ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। এতো উচ্চমানের ডিসিপ্লিন যে, নেতার মুখ থেকে বয়কোটের নির্দেশ বের হওয়া মাত্র গোটা দলের প্রতিটি সদস্য অপরাধীর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। প্রকাশ্যে তো দূরের কথা নির্জনে পর্যন্ত একান্ত নিকটাত্মীয় কিংবা পরমবন্ধুও তার সাথে কথা বলেনা। স্ত্রী পর্যন্ত পৃথক হয়ে যায়। খোদার কসম দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমার আন্তরিকতায় কি তোমাদের কোনো সন্দেহ আছে? পরম নিষ্ঠাবান জেনে তাকে জবাব দেয়া হয়, আমাদের নিকট নয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট থেকে আন্তরিকতার সার্টিফিকেট লাভ করো। আরেক দিকে নৈতিক ভাবধারা এতো উন্নত ও পবিত্র যে, এক ব্যক্তির মাথা নীচু হওয়া মাত্রই কোনো শকুনের দল তার গোশত খাওয়ার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েনা। বরঞ্চ এই গোটা শাস্তির সময়টা তাঁরা তাঁদের এই বিপদগ্রস্ত ভায়ের জন্যে মর্মবেদনা অনুভব করে এবং তাঁকে তুলে পুনরায় বুকে জড়িয়ে ধরার জন্যে তাঁরা উদগ্রীব অধীর হয়ে থাকে। আর তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা ঘোষিত হবার সাথে সাথে তাঁরা নিমিষে তাঁর দিকে একে অপরের আগে দৌড়িয়ে এসে তাঁকে সুসংবাদ শুনায়। এ হচ্ছে সেই সত্যনিষ্ঠ সমাজের আদর্শ যা কুরআন এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ব্যক্তিগণের যে ক্ষমা লাভ হয়েছিল আর এই ক্ষমার কথা ঘোষণার ভাষায় যে দয়া ও অনুকম্পা বর্ষিত হয়েছিল, তা তাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম ইখলাসের জন্যেই বর্ষিত হয়েছিল। এর প্রমাণ তাঁরা পেশ করেছেন পঞ্চাশ দিনের কঠিন দন্ড ভোগ কালে। অপরাধ করার পর তাঁরা যদি অহংকারী হয়ে পড়তেন এবং নেতার অসন্তোষের জবাবে ক্রোধ ও শত্রুতায় নিমজ্জিত হতেন; আর দন্ডাদেশের ফলে অহংকারী লোকদের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন; বয়কোট কালে যদি "বিচ্ছিন্ন থাকতে রাজি কিন্তু অহমীকা বর্জনে রাজি নয়" এরূপ ভাবাচরণ প্রদর্শন করতেন; এই দীর্ঘ দন্ড ভোগ কালে যদি সমাজের লোকদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়াবার চেষ্টা করতেন আর অন্যান্য অসুন্তুষ্ট ক্ষুদ্ধ লোকদের খুঁজে খুঁজে যদি একটি সংস্থা

গড়ে তুলবার চেষ্টা করতেন তবে তাদের ক্ষমা করবার কোনো প্রশ্নই উঠতোনা। তাদেরকে তো অবশ্য সমাজ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করা হতো। আর তখন এ শাস্তির পর নতুন করে তাদের চিরদিনের তরে হঠকারিতায় লিপ্ত থাকার শাস্তি প্রদান করা হতো। এরপর আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার চেষ্টা সংগ্রামে অংশ নেবার সৌভাগ্য তাদের আর কোনো দিনই হতোনা।

কিন্তু এই তিনজন বুযুর্গই কঠিন দন্ড ভোগ কালে এরূপ পন্থা অবলম্বন করেননি। যদিও এরূপ করার পথ তাদের জন্যে খোলা ছিলো। পক্ষান্তরে তাঁরা সেই আদর্শ নীতিও ভাবধারাই অবলম্বন করেন যা এই মাত্র আপনারা পড়ে আসলেন। এই আদর্শ নীতি ও আচরণের পথ অবলম্বন করে তাঁরা প্রমাণ করলেন যে, খোদার আনুগত্য ও দাসত্ব তাঁদের হৃদয় থেকে সকল মূর্তি ও দেবতার আনুগত্য চিরতরে খতম করে দিয়েছে। নিজেদের গোটা সত্তাকে তারা আল্লাহর পথে চেষ্টা সংগ্রামের কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিজের ফিরে যাবার জাহাজগুলো তারা এমনভাবে জ্বালিয়ে দিয়ে ইসলামি সমাজে প্রবেশ করেছেন যে, এখান থেকে কোথাও প্রত্যাবর্তনের কোনোই অবকাশ নেই। এখানেই আঘাতে আঘাতে বিক্ষত হবেন, কিন্তু বিন্দু মাত্র বিচলিত হবেন না। অন্য কোনো স্থানে বিরাট সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া গেলেও তা তারা কিছুতেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবেননা। এরপরও যদি এমন লোকদেরকে বুকে তুলে নেয়া না হলো, তবে আর কী-ই করা হলো! একারণে মহান আল্লাহ এমন মহব্বতের ভাষায় তাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করলেন: "আমি তাদের দিকে ফিরলাম যেনো তারা আমার দিকে ফিরে আসে।"

এ কয়টি শব্দ এমন এক মর্মস্পর্শী চিত্র অংকিত হয়েছে যে, মনিব তো প্রথমে গোলামদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, কিন্তু তারা যখন স্থান ত্যাগ করে চলে গেলনা, বরঞ্চ মন ভাংগা হয়ে তাঁরই দুয়ারে বসে থাকলো, তখন তাদের চরম আনুগত্যের পরম ভাবধারা দেখে মনিব আর স্থির থাকতে পারলেন না। মহব্বতের আতিশয্যে বেরিয়ে এসে দরজা থেকে গোলামদের বুকে তুলে নিলেন।

মুসলমানদের কাছে সাহাবাদের মর্যাদা যেমন হওয়া উচিত

মানব সমাজে নবীর স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত নাজুক।
একটি সাধারণ কথা যা অন্য কোনো মানুষের জীবনে সংঘটিত হলে তা তেমন কোনো গুরুত্বই বহন করেনা, কিন্তু অনুরূপ ঘটনাই নবীর জীবনে সংঘটিত হলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। তাই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নবী-রসূলদের জীবন পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তাদের অতি ক্ষুদ্র কোনো পদক্ষেপও আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী না হয়। নবীর দ্বারা এমন কোনো ক্ষুদ্র কাজও সংঘটিত হয়ে গেলে সংগে সংগে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে, যাতে ইসলামি আইন ও তার উৎস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে শুধু আল্লাহর কিতাব আকারে নয় বরং নবীর "উসওয়ায়ে হাসানা" বা উত্তম জীবন আদর্শরূপেও আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছে এবং তার মধ্যে অণু পরিমাণও এমন কোনো জিনিস সংমিশ্রিত হতে না পারে, আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির সাথে যার কোনো মিল নেই ।

উপরে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে আপনা থেকেই যে বিষয়টি বুঝা যায় তা এই যে, একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও যখন রসূলুল্লাহ সা.-কে ভুল দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা শুধু সংশোধনই করা হয়নি, বরং রেকর্ডভুক্তও করা হয়েছে তখন তা অকাট্যভাবে আমাদের মনে এ আস্থা সৃষ্টি করে যে, নবীর পবিত্র জীবনকালের যেসব কাজকর্ম ও হুকুম-আহকাম বর্তমানে আমরা পাচ্ছি এবং যেসব কাজকর্ম ও হুকুম আহকাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো তিরস্কার বা সংশোধনী রেকর্ডে নেই তা পুরোপুরি সত্য ও নির্ভুল এবং আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। ঐসব কাজকর্ম ও আদেশ নিষেধ থেকে আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে হিদায়াত ও পথনির্দেশ গ্রহণ করতে পারি ।

কুরআন মজিদের বাণী থেকে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হচ্ছে, যে পবিত্র রসূলের সম্মান ও মর্যাদাকে আল্লাহ নিজে বান্দাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে গণ্য করেন সেই রসূল সম্পর্কে কুরআন মজিদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের খুশি করার জন্যে একবার আল্লাহর হালালকৃত একটি জিনিসকে নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন। আর রসূলের পবিত্র স্ত্রীগণ, আল্লাহ নিজে যাদেরকে ঈমানদার মা বলে ঘোষণা করেন এবং যাঁদেরকে সম্মান করার জন্যে তিনি নিজে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন, কিছু ভুল-ত্রুটির জন্যে তাঁদেরকেই আবার তিনি কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তাছাড়া রসূলকে তিরস্কার এবং তাঁর স্ত্রীদেরকে সাবধান চুপিসারে করা হয়নি, বরং তা সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা সমস্ত উম্মতকে চিরদিন পড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলার এরূপ কোনো অভিপ্রায় ছিলোনা, কিংবা থাকতেও

পারেনা। একথাও স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের এ সূরা পাঠ করে কোনো মুসলমানের অন্তর থেকে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা উঠে যায়নি। তাহলে কুরআনে এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে তাঁদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান প্রদর্শনের সঠিক সীমারেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। নবীগণ কেবল নবীই, তাঁরা খোদা নন যে, তাঁদের কোনো ভুল-ত্রুটি হতে পারেনা। নবীর মর্যাদা এ কারণে নয় যে, তাঁর কোনো ভুল-ত্রুটি হওয়া অসম্ভব। বরং নবীর মর্যাদা এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ। তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল-ত্রুটিকেও আল্লাহ সংশোধন না করে ছেড়ে দেননি।

এভাবে আমরা এ আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করি যে, রসূলের রেখে যাওয়া আদর্শ আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তব প্রতিনিধিত্ব করছে। একইভাবে সাহাবায়ে কিরাম হোন বা রসূলের সা. পবিত্র স্ত্রীগণ হোন, তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা বা মানব সত্তার উর্ধ্বে কিছু ছিলেননা। তাদেরও ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব ছিলো। তাঁরা যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন তার কারণ ছিলো এই যে, আল্লাহর রসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাঁদেরকে মানবতার সর্বোত্তম নমুনা বানিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা তা এ কারণেই। তাঁরা ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ যুক্ত ছিলেন এরূপ অনুমান ও মনগড়া ধারণার উপর তাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ সা.-এর কল্যাণময় যুগে সাহাবায়ে কিরাম কিংবা রসূল সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে যখনই কোনো ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তখনই তাদের সতর্ক করা হয়েছে ও ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। রসূল সা. নিজেও তাদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন যা হাদিস গ্রন্থেসমূহের বহু সংখ্যক জায়গায় উল্লেখ আছে। আল্লাহ তায়ালা নিজেও কুরআন মজিদে তাঁদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করে তা সংশোধন করেছেন, যাতে মুসলমানগণ কখনই তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান দেখানোর এমন কোনো অতিরঞ্জিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে না নেয় যা তাঁদেরকে মানুষের পর্যায় থেকে উঠিয়ে আল্লাহর মর্যাদায় বানিয়ে না দেয়।

আপনি যদি চোখ খুলে কুরআন মজিদ অধ্যয়ন করেন তাহলে আপনার সামনে এর দৃষ্টান্ত একের পর এক আসতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানে ওহুদ যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে সাহাবা কিরামদের সম্বোধন করে বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা (সাহায্য সহযোগিতার) যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দিয়েছিলেন তা তিনি পূরণ করেছেন যখন তোমরা তাদেরকে তাঁর ইচ্ছায় হত্যা করছিলে। অবশেষে তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং কাজের ব্যাপারে মতানৈক্য করলে আর যে জিনিসের আকাংখা তোমরা করছিলে আল্লাহ তা'য়ালা যে মাত্র

তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন (অর্থাৎ গনীমতের সম্পদ) তখনই তোমরা তার হুকুমের নাফরমানি করে বসলে । তোমাদের মধ্যে কেউ ছিলো পার্থিব স্বার্থের প্রত্যাশী এবং কেউ ছিলে আখেরাতের প্রত্যাশী। এ অবস্থায় তোমাদের পরীক্ষার জন্যে আল্লাহ তাদের মোকাবেলায় তোমাদের পরাস্ত করে দিলেন। আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও মেহেরবান।" (আয়াত ১৫২)

অনুরূপভাবে সূরা নূরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে অপবাদের উল্লেখ করে সাহাবীগণকে বলেন : "এমনটা কেন হলো না যে, যখন তোমরা এ বিষয়টি শুনেছিলে মুমিন নারী ও পুরুষ সবাই নিজে সে বিষয়ে ভালো ধারণা পোষণ করতে এবং বলে দিতে যে, এটা স্পষ্ট অপবাদ। ..... দুনিয়া ও আখেরাতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়া না হতো তাহলে যে বিষয়ের মধ্যে তোমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে তার পরিণামে কঠিন আযাব তোমাদের গ্রাস করতো। একটু ভেবে দেখো, যখন তোমাদের মুখে মুখে কাহিনীটার চর্চা হচ্ছিল এবং তা ছড়াচ্ছিল এবং তোমরা এমন কিছু বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা ছিলনা। তোমরা এটাকে একটা মামুলি ব্যাপার মনে করছিলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা ছিলো গুরুতর বিষয়। কেন তোমরা এ কথা শোনামাত্র বললে না যে, আমাদের জন্যে এরূপ কথা মুখে আনাও শোভা পায়না। সুবহানাল্লাহ! এটা তো একটা গুরুতর অপবাদ? আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো যেন তোমরা এরূপ আচরণ না করো।" (সূরা নূর : আয়াত ১২-১৭)

সূরা আহযাবে রসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : "হে নবী, তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্য চাও তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে উত্তম রূপে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতের প্রত্যাশী হয়ে থাকো তাহলো জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্যে বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব : আয়াত ২৮-২৯)

সূরা জুম'আতে সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : "তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল তামাশা দেখে সে দিকে ছুটে গেলো এবং (হে নবী) তোমাকে (খোতবা দানরত অবস্থায়) দণ্ডায়মান রেখে গেলো। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম । আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।" (আয়াত ১১)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হাতের ইবনে আবী বালতায়া রসূলুল্লাহ সা.-এর মক্কা অভিযানের খবর গোপনে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সূরা মুমতাহিনায় তাঁর এ কাজের কঠোর সমালোচনা ও তিরস্কার করা হয়েছে।

কুরআন মজিদের মাধ্যমেই এসব উদাহরণ বর্তমান, যে কুরআন মজিদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সাহাবা কিরাম এবং রসূলের পবিত্র স্ত্রীগণের সম্মান ও মর্যাদা নিজে বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়ারাদু আনহু, অর্থাৎ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট বলে ফরমান শুনিয়েছেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দেখানোর এই শিক্ষা মধ্যপন্থার উপর ভিত্তিশীল। এ শিক্ষা মুসলমানদেরকে মানুষ পূজার সেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে যার মধ্যে ইহুদি ও খৃষ্টানরা নিপতিত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় মনীষী হাদিস, তাফসির এবং ইতিহাস বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে যেসব জায়গায় সাহাবায়ে কিরাম, রসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা ও পূর্ণতার যে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে তাদের দুর্বলতা, বিচ্যুতি এবং ভুল-ত্রুটির ঘটনা বর্ণনা করতেও দ্বিধা করা হয় নাই। অথচ বর্তমান সময়ের সম্মান প্রদর্শনের দাবিদারদের তুলনায় তাঁরা তাঁদের বেশি মর্যাদা দিতেন এবং সম্মান প্রদর্শনের সীমারেখাও তারা এদের চেয়ে বেশি জানতেন।

১. সাহাবীগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ ও ফিতনা সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত:

ফিতনার কারণ: ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তারা এক নিকৃষ্ট প্রতারককে এ কাজের জন্য নির্ধারণ করে, যে মিছেমিছি নিজেকে মুসলিম বলে জাহির করতো। সে ছিল আব্দুল্লাহ ইবন সাবা নামক ইয়ামানের এক ইয়াহূদী। অতঃপর এ ইয়াহূদী খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলীফা উসমান ইবন আল্ফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বিরুদ্ধে তার হিংসা ও ঈর্ষার বিষ সম্প্রসারিত করতে শুরু করে এবং তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে থাকে। ফলে কিছু অদূরদর্শী দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোক যারা ফিতনা-ফাসাদ পছন্দ করে তার ধোঁকায় পতিত হয়ে তার পাশে জমায়েত হলো, এ ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত খলীফায়ে রাশেদ উসমানরাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিতান্ত মযলুম হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তার শাহাদাতের পর মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। উক্ত ইয়াহূদী এবং তার অনুসারীদের প্ররোচনায় এ ফিতনা প্রবল আকার ধারণ করল এবং সাহাবীগণ নিজ নিজ ইজতেহাদ মোতাবেক যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। '

আত-তাহাবিয়া' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারক বলেন: رفض 'রাফদ' এর ফিতনা সৃষ্টি করে এক মুনাফিক ও যিন্দিক তথা বে-দীন ব্যক্তি। তার ইচ্ছা ছিল দীন ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়া এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নিন্দা ও কুৎসা রটনা করা যেমন উলামায়ে কেরাম তা বর্ণনা করেছেন। কেননা আব্দুল্লাহ বইন সাবা যখন ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণ করে, তখন সে মূলতঃ স্বীয় ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও নোংরামীর জাল বিস্তার করে ইসলামের বিপর্যয় ও ক্ষতি সাধন করতেই চেয়েছিল, খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে ইয়াহুদী ধর্ম যেমনটা করেছিল। তাই সে ইবাদাতগুজার হওয়ার ভান করল। সৎ কাজের নির্দেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কাজ জাহির করতে লাগল এমনকি উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে ফিতনা ছড়িয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টায় সে লিপ্ত হল। এর পর যখন সে কুফায় এলো, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর পক্ষে বাড়াবাড়ি করা ও তাকে সাহায্য করার ভান করলো, যাতে সে তার উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে সে নির্দেশ পৌঁছোলে তিনি তাকে হত্যার হুকুম দিলেন। কিন্তু সে কার্কিস এর দিকে পালিয়ে গেল। ইতিহাসে তার সব ঘটনাই প্রসিদ্ধ।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহ, বলেন: যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করলেন, তখন মুসলিমদের হৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং সৎ লোকেরা অপদস্ত হল। যারা আগে ফিতনা সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিল, তারা ফিতনা সৃষ্টি করে বেড়াতে লাগল এবং যারা কল্যাণ ও সততা প্রতিষ্ঠা করতে চাইত, তারা তা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় লোকেরা আমীরুল মুমিনীন আলী ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে বাই'আত গ্রহণ করল। সে সময় তিনিই খেলাফতের সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং জীবিত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু যেহেতু মানুষের অন্তকরণ হয়ে পড়েছিল বিভক্ত এবং ফিতনা- ফাসাদের আগুন ছিল প্রজ্বলিত, তাই এক কথার ওপর সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি। মুসলিমদের জামা'আত ও সুসংগঠিত হতে পারে নি। ফলে খলীফা নিজে এবং উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বর্গের কেউই ঈপ্সিত কল্যাণ সাধন করতে সমর্থ হন নি। বহু লোক বিচ্ছিন্নবাদিতা ও ফিতনা ফাসাদে লিপ্ত হল। এরপর যা হবার তাই হলো।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মধ্যকার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ বিবাদ সম্পর্কে ওজর পেশ করতে গিয়ে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন: আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে যুদ্ধের সময় মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু খেলাফত দাবি করেন নি এবং খেলাফতের জন্য কেউ তার কাছে বাই'আতও করেন নি। নিজেকে খলীফা মনে করে কিংবা খেলাফতের হকদার ভেবে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু

'আনহুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন নি। এ ব্যাপারে যে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি সে কথারই স্বীকৃতি প্রদান করতেন। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং তার সাথীগণ এ মনোভাব পোষণ করেননি যে, তারা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও তার সাথীদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবেন এবং নিজেদেরকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবেন বরং আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথীগণ ভাবলেন, মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং তার ও তার সঙ্গীদের উচিত আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আনুগত্য করা এবং তার কাছে বাই'আত করা। কেননা মুসলিমদের জন্য একজন খলীফাই শুধু হতে পারে। এদিক থেকে তারা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আনুগত্য থেকে দূরে অবস্থান করছে এবং এ দায়িত্ব পালন থেকেবিরত থাকছে অথচ তারা শক্তিমত্তারও অধিকারী। তাই আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জরুরি মনে করলেন। যাতে তারা এ দায়িত্ব পালন করে এবং খলীফার আনুগত্য ও জামা'আতের ঐক্য বহাল থাকে। পক্ষান্তরে মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও তার সাথীদের বক্তব্য ছিল; আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর আনুগত্য ও বাই'আত তাদের ওপর ওয়াজিব নয় এবং এজন্য যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে তারা হবেন মজলুম। এর কারণ বর্ণনায় তারা বলেন: কেননা সকল মুসলমানের ঐক্যমতে উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মজলুম হয়ে শহীদ হয়েছেন এবং তার হত্যাকারীগণ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বাহিনীতে অবস্থান করছে। বাহিনীতে তাদেরই প্রাধান্য এবং শক্তি বিদ্যমান। আমরা সংযত থাকলে তারা আমাদের ওপর যুলুম করবে এবং চড়াও হবে অথচ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর পক্ষে তাদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। যেমনিভাবে উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ব্যাপারে তাদেরকে বাধা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। অতএব, আমাদের এমন খলীফার কাছে বাই'আত হওয়া উচিত, যিনি আমাদের প্রতি ইনসাফ করতে সক্ষম এবং আমাদের প্রতি ইনসাফ করার জন্য তিনি চেষ্টা সাধনা করবেন।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে যে মতবিরোধ ও ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতকে দু'কথায় সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করা যায়। প্রথমত: সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ ও মতবিরোধের ব্যাপারে তারা চুপ থাকবে এবং এ ব্যাপারে তারা চুলচেরা বিশ্লেষণ থেকেও বিরত থাকবে। কেননা এ ধরনের ক্ষেত্রে চুপ থাকাটাই নিরাপত্তা লাভের পন্থা। আর তাদের জন্য এ ভাবে দো'আ করবে।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ: "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের আগে আমাদের যে সব ভাইয়েরা ঈমান এনেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ

রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত নম্বর: ১০]

২. যেসব রিওয়ায়েতে সাহাবায়ে কেরামের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে, বিভিন্ন পন্থায় নিম্নলিখিতরূপে সেগুলোর জবাব দেওয়া:

ক. এসব রিওয়ায়েতের মধ্যে এমন কিছু মিথ্যা বর্ণনাও রয়েছে যা সাহাবায়ে কেরামের বদনাম করার উদ্দেশ্যে তাদের ও ইসলামের শত্রুগণ রচনা করেছে।

খ. এগুলোতে এমন বর্ণনাও আছে যাতে কিছু পরিবর্ধন করা হয়েছে, কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এর সঠিক রূপটি বিগড়ে দিয়ে তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। ফলে তা বিকৃত বলে পরিগণিত, যার দিকে ফিরে তাকানোও ঠিক নয়।

গ. এ রিওয়ায়েতগুলোর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম মা'জুর ছিলেন বলে মনে করতে হবে। কেননা তারা সকলেই ইজতিহাদ করেছিলেন এবং এতে হয় তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আর বিষয়টিও ছিল ইজতেহাদের ক্ষেত্র যাতে ইজতেহাদকারী সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে পাবেন দু'টি সওয়াব এবং ভুল করলে একটি সাওয়াব ও ভুলটি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কেননা হাদীসে এসেছে,

ًإذا حكم الحاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخطأ فَلَهُ أَجْر
"হুকুম দানকারী কোনো ব্যক্তি যদি ইজতেহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তবে তিনি দু'টি সওয়াব পাবেন এবং ইজতিহাদ করে ভুল সিদ্ধান্ত দিলে একটি সওয়াব পাবেন।" [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৬]

ঘ. তারা ছিলেন আমাদের মতই মানুষ। একক ভাবে তারাও ভুল করতে পারেন। তাই একক ব্যক্তি হিসাবে তারা কেউই গোনাহ-খাতা থেকে মাসুম ছিলেন না; কিন্তু তাদের থেকে যে ভুল-ত্রুটিই প্রকাশিত হয়েছে সে জন্য তাদের বহু কাফফারা তথা নেক আমল রয়েছে, যা দ্বারা সে ভুল-ত্রুটি মাফ হয়ে যায়। যেমন,

১. সে ভুল থেকে তারা তাওবা করেছেন। আর দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, তাওবা সকল গুনাহ-খাতা মিটিয়ে দেয়।

২. তাদের অনেক ফযীলত ও নেক আমল রয়েছে, যদ্বারা তাদের কোনো গুনাহ-খাতা প্রকাশ পেলে তা মাফ হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

[إن الحسنات يذهبن السيئات) [هود(١١٤ :

অর্থ: "পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়।" [সূরা হূদ, আয়াত: ১১৪]

৩. অন্যদের নেক আমলের চেয়ে তাদের নেক আমলসমূহ বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। ফযীলত ও মর্যাদায় কেউ তাদের সম পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য হতে প্রমাণিত যে, তারাই ছিলেন সর্বোত্তম প্রজন্ম, তাদের এক মুদ বা এক অঞ্জলী পরিমাণ সদকা অন্যদের অহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ সদকা করার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাদেরকে ও সন্তুষ্ট রাখুন।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহ, বলেন: সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও আয়িম্মায়ে কেরাম মনে করেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউই মাসুম নয়; না রাসূলের আত্মীয় সম্পর্কের কেউ, না সাহাবীগণের অগ্রবর্তী দলের কেউ এবং না এতদ্ব্যতীত অন্য কেউ। বরং তাদের মতে সাহাবীগণের থেকে গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাওবা দ্বারা তাদের গুনাহ মাফ করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। তাদের নেক আমলের বিনিময়ে তাদের গুনাহ মিটিয়ে দেন ইত্যাদি আরো বহু পন্থায় তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

• وَالَّذِى جاء بالصدق وصدق به أوليك هُمُ الْمُتَّقُونَ [٣٣] لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ [٣٤] لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُون٣٥] َ

অর্থ: "যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই মুত্তাকী। তাদের জন্য তাদের পালন কর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার, যাতে এরা যে সব মন্দ কাজ করেছিল আল্লাহ তা মার্জনা করে দেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন।" [সূরা আয- যুমার, আয়াত: ৩৩-৩৫]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً• قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وأصلح لي في ذريتي• إنى تبتُ إِلَيْكَ وَإِنى مِنَ الْمُسْلِمِينَ[١٥] أَولَيكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أصحاب الجنة١٦]

অর্থ: "অবশেষে যখন সে শক্তি সামর্থ্যের বয়সে পৌঁছে এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয়, তখন বলে, হে আমার রব। তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নি'আমতের শোকর করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি। আমার জন্য আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর। আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং আমি অবশ্যই তোমার নির্দেশ মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আমি এমন লোকদেরই সুকৃতিগুলো কবুল করি এবং মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করে দেই। তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ১৫-১৬]

ফিতনার সময় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল, ইসলামের শত্রুগণ তাকে সাহাবীগণের ওপর অপবাদ আরোপ করার এবং তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার উপায় বানিয়ে নিয়েছে, এমনকি তারা নিজেদের কর্মের মাধ্যমে ইসলামের সুবর্ণ ইতিহাস ও সর্বোত্তম যুগের সালফে সালেহীন সম্পর্কে অনবহিত কিছুসংখ্যক মুসলিম যুবকদের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করেছে, যাতে করে তারা ইসলামের প্রতি আঘাত হানতে পারে, ও মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি আনয়ন করতে পারে এবং এ উম্মতের পূর্ববর্তীদের প্রতি পরবর্তীদের মনে একরাশ ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে, যেন তারা সালফে সালেহীনের অনুকরণ না করে এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করাও ছেড়ে দেয়। অথচ আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ: "আর যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে: হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের আগে আমাদের যে সব ভাইয়েরা ঈমান এনেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

তথ্যসূত্র

1. সহিহ মুসলিম ১৮: ৮নং
2. সহিহ মুসলিম : ১৮৯
3. সূরা বাক্বারা :১৪৩
4. তাফসীর ইবনে কাসীর
5. সূরা ফাতাহ :২৯

6. সুরা তাওবা :১০০ ; মা'আরিফুল কুরআন পৃষ্ঠা ৫৯১
7. সূরা ফাতাহ : ২৯
8. সূরা আনফাল: ৬৪
9. সূরা আনফাল: ৬৩
10. সূরা হাদিদ : ১০
11. সূরা আল ইমরান :১০৩
12. সূরা আরাফ : ১৫৭
13. সূরা হুজুরাত : ১৫
14. সূরা হুজুরাত : ৭
15. সূরা ফাতহ :২৬
16. সূরা আনফাল : ৪
17. সূরা আল ইমরান :১১০
18. সূরা নিসা :১১৫
19. সূরা আনফাল :৭৪
20. সূরা তাওবাহ : ১১৭
21. সূরা আহযাব : ২৩
22. সূরা নামল : ৫৯
23. সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩৬৬৫
24. ফাতহুল বারী ৭ম খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা
25. সহিহ বুখারী, হাদিস ৩৬৭৩; বিস্তারিত ব্যখা -ফাতহুল বারী ৭ম খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা
26. সূরা আহযাব : ৩৩
27. আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৩৮৪
28. আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৭৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৩৮৫)
29. আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৭৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৩৮৬)
30. তিরমিজি, হাদিস : ৩৮৫৮)
31. বুখারি, হাদিস : ৩৩৯৭; মুসলিম, হাদিস : ৪৬১১
32. মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১৬৮০৩
33. সূরা হাশর : ৮
34. সূরা আনফাল : ৭৪
35. সূরা তাওবা : ১০০
36. সূরা আল ইমরান : ১৯৫

37. সূরা হাশর : ০৯
38. সূরা তাওবা :১০০
39. বুখারি, হাদিস : ১৩
40. বুখারি, হাদিস : ৩৭৮০
41. সূরা আহযাব : ২৩
42. মুসলিম, হাদিস : ১৮৮৯
43. সূরা তাওবা : ৪১
44. বুখারি হাদিস : ২৭৯২
45. সূরা আম্বিয়া : ৭৩
46. বুখারি, হাদিস : ৪১০৪
47. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১১৮৭৯
48. সূরা তওবা: ৪০
49. সূরা আহযাব : ২৩
50. সূরা আলে ইমরান : ১১০
51. সূরা তওবা : ৮৮
52. সূরা তওবা : ১১৯
53. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৬০৩৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩০৫৭৫
54. সূরা ত্বহা : ১২৩
55. ছহীহুত তারগীব ওয়াততারহীব, পৃ. ৫৮
56. ফাজায়েলে কুরআন, আবু উবায়দ ১/২৫৯
57. সূরা নূর : ৫১
58. ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃ. ৪৭৬; তাফসীরী হাশিয়া
59. সূরা বাক্বারা : ১৪৪
60. সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৪৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫২৫; তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/১০৭-১০৮
61. সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫২৬; তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/১০৯-১১০
62. সূরা বাক্বারা : ১৪৩
63. সূরা মায়িদা : ৯০-৯১
64. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৩৭৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭০

65. তাফসীরে তাবারী ১০/৫৭২; তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৩৪৫
66. সূরা সাজদা : ১৬
67. সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৬৪২.
68. বুখারি, হাদিস : ৩২১৫
69. সিরাতুল মুস্তফা : ১/১৩৭
70. বুখারি, হাদিস : ৩)
71. ইবনে হিশাম : ১/৪৪০-৪৪১
72. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া – ৪র্থ খন্ড, উহুদ যুদ্ধ
73. সিরাতুল মুস্তফা : পৃ. ১৯৯
74. সূরা তওবা : ২৪
75. সূরা তাওবা: ১১৮
76. সূরা আল ইমরান : ১৫২
77. সূরা নূর : ১২-১৭
78. সূরা আহযাব : ২৮-২৯
79. সূরা জুম'আ : ১১
80. সূরা আল-হাশর : ১০
81. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৬
82. সূরা হূদ : ১১৪]
83. সূরা আয- যুমার : ৩৩-৩৫
84. সূরা আল-আহকাফ : ১৫-১৬
85. সূরা আল-হাশর : ১০